রক্তকালীর মাঠ

ডঃ গৌরী দে

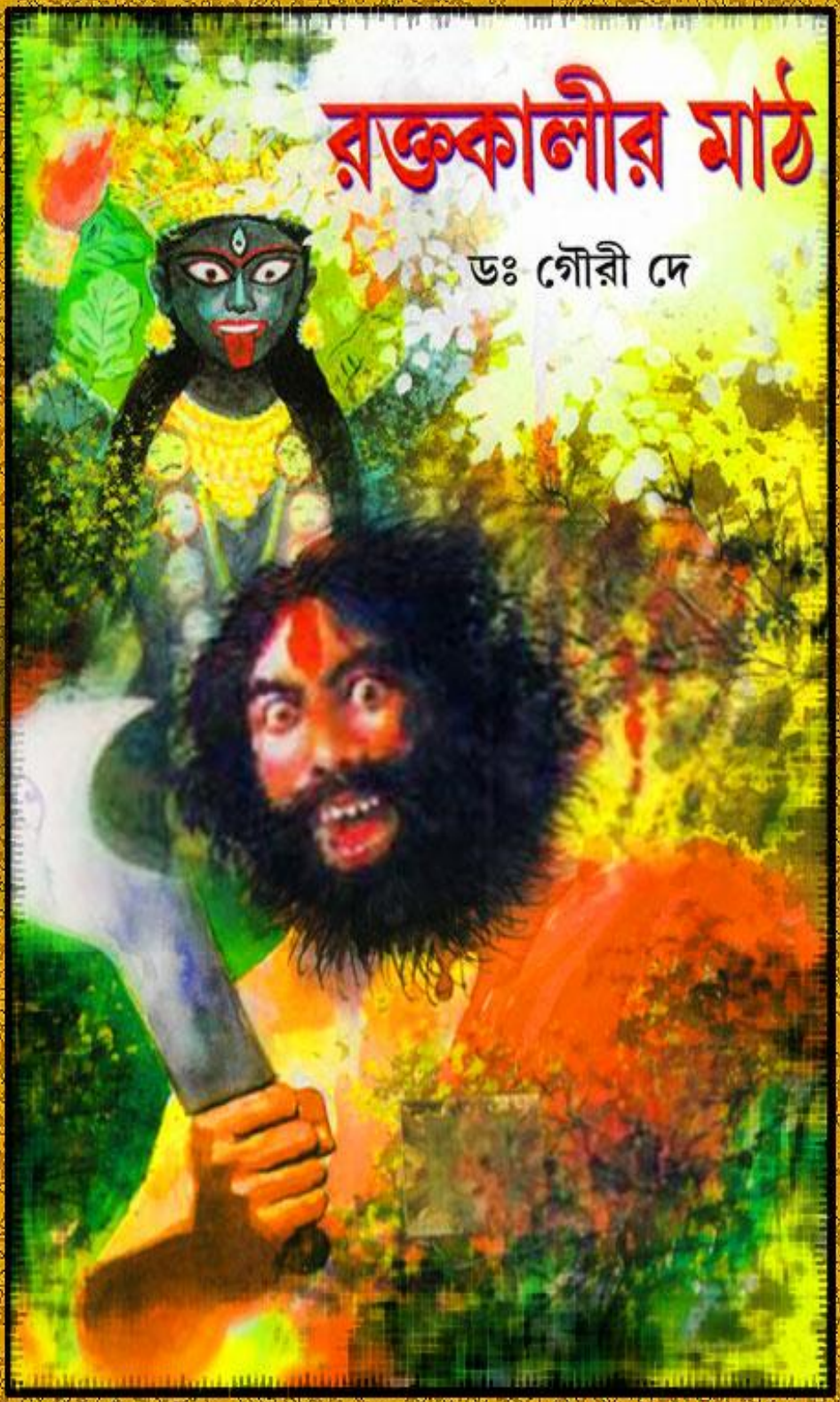

banglabooks.in

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link

Get *More*
Free
eBook

VISIT
WEBSITE

Click here

সূচীপত্র

১। রক্তকালীর মাঠ ৯

২। অতিথি ২৩

৩। আলেয়া ৩০

৪। দানব ৪১

৫। কাটামুণ্ডু ৫৩

৬। চলমান ঘটনা ৬৪

৭। মোমবাতির আলোয় ৭৫

৮। প্রতিহিংসা ৮৮

৯। ভূতুড়ে খেলা ৯৮

১০। কিউরিও ঘর ১১১

রক্তকালীর মাঠ

ডঃ গৌরী দে

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

RAKTA KAALIR MAATH
By Dr. Gouri Dey
CODE NO. 63 R 23

প্রকাশ করেছেন :
শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
কলকাতা পুস্তক মেলা
জানুয়ারি ২০০৫

ছেপেছেন :
বি. সি. মজুমদার
বি. পি. এম'স প্রিন্টিং প্রেস
রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর
২৪ পরগনা (উত্তর)

বর্ণ-সংস্থাপন :
বীণাপাণি প্রেস
১২/১এ বলাই সিংহ লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ :
বিজন কর্মকার

দাম : টা. ৪৫.০০

উৎসর্গ

দ্বিতীয় শৈশব বলে একটা কথা আছে।
আমার বুড়ো বাবা আর বুড়ি মা
হলেন সেই দুটি ছোট্ট শিশু। ওঁরা কিন্তু
ভূতের গল্প পড়তে খুব ভালোবাসেন।
তাই এবার বইটা আমি তাঁদেরই দিলাম।

ভূমিকা

যুগ বদলাচ্ছে তাই রুচিও বদলাচ্ছে। এখন সবার প্রিয় হয়ে উঠছে অলৌকিক আর রহস্য গল্প। এবারে আমি এক নতুন ধরনের গবেষণা চালিয়েছি। সেটা হল অলৌকিক অর্থাৎ ভূতুড়ে গল্পের মধ্যে রহস্যের ছোঁয়া। তোমরা যারা দুটোই ভালোবাসো, দুটোর স্বাদই পাবে এই গল্পগুলোতে।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য কোরো। সেটা হল—তার সঙ্গে মিশিয়েছি কিছুটা ঐতিহাসিক তথ্য। যেমন ধরো, আন্দামান যাত্রার মধ্যে যে বর্ণনা তা কিন্তু কল্পনা নয় সত্যি। তোমরা আন্দামান সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানতে পারবে। অথবা মিশরের মমির সমাধি বা পিরামিডের কথা লিখতে গিয়ে যা লিখেছি তা কিন্তু একটাও মিথ্যে নয়। এবারের এই নতুন ধরনের, নতুন স্বাদের গল্প তোমাদের কেমন লাগল জানাতে ভুলো না। যদিও বারবার বলা সত্ত্বেও কিন্তু তোমরা সেটা আমাকে জানাওনি। আমি বুঝতে পারি যখন তোমরা বইমেলায় ভূতের বই কেনার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়।

ঠিক আছে। তোমরা সব ভালো থাকো। বইমেলায় তোমাদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে রইল।

তোমাদের ঠাম্মা

রক্তকালীর মাঠ

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবার পর বেশ বড় একটা আড্ডা বসেছিল অশোকদের বাড়ি। সকলের মুখে এক কথা—কোথাও ঘুরে এলে হয়। তারপর যা হয়ে থাকে, এ একটা জায়গা বলছে, ও একটা জায়গা বলছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আর একজন সেটা কাটাচ্ছে। শেষে ঠিক হল, কয়েকটা জায়গার নাম থাক—তারপর যার যেখানে ইচ্ছে হবে যাবে। বসন্ত বলল, আমার ইচ্ছে—দার্জিলিঙ—গরম বেশ পড়েছে। তাছাড়া আমার কোনোদিন দার্জিলিং দেখা হয়নি। আমার সঙ্গে যে যেতে চায় যেতে পারে। অশোক আর মিহির বলল, আমরা রাজি। সায়ন বলল, জানিস, কাল আমার বাড়ি এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। বাবার বন্ধু, কি সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলেছিলেন তোদের কি বলব।

মৈনাক বলল—বল না শুনি কি গল্প।

সায়ন বলল—ভদ্রলোক হুগলি জেলার বোসো গ্রামের বাসিন্দা। উনি বললেন ব্যান্ডেল স্টেশানে নেমে প্রায় ছয়-সাত মাইল ভেতর দিকে একটা অজ পাড়াগাঁ ছাড়িয়ে

অনেকটা ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠ পেরিয়ে একটা কালীমন্দির আছে। লোকে বলে ওটা প্রায় দুশো বছরের পুরনো মন্দির। সেই মন্দিরের পাশ দিয়ে একটা চওড়া খাল কাটা রয়েছে—কে জানে কবে কখন কারা কেটেছিল, তবে ঐ খালের সঙ্গে যে গঙ্গার যোগাযোগ আছে তাতে সন্দেহ নেই। খালটায় সবসময় জল থাকে আর সে জলের আবার গতিও আছে। ঐ খালটা নাম হল 'মরণ খাল'!

—সেকি রে! 'মরণ খাল' বলে আবার নাম হয় নাকি? জিগ্যেস করল মৈনাক।

সায়ন বলল—আমিও ঠিক এক প্রশ্ন করেছিলম ওনাকে। উনি বললেন—ঠিক মন্দিরের সামনে একটা হাঁড়িকাঠ বসানো আছে। ওখানে আগে নাকি নরবলি দেওয়া হত। তারপর মোষ, এখন পাঁঠায় এসে দাঁড়িয়েছে। আর ঐ মাঠটা তখন ছিল জঙ্গলে ভরা। ডাকাতরা ওখানে আশ্রয় নিত আর ঐ মন্দিরে পুজো করে ডাকাতি করতে যেত। ঐ ডাকাতদের একজন মা কালীর পুজো করত—করতে করতে সে নাকি কাপালিক হয়ে যায়। লোকে বলে আজও সে রাত্তিরে মায়ের পুজো করে নরবলি দেয়। রাত দুটোর পর দূরের গ্রামের লোকেরা শুনতে পায় কে যেন জয় মা জয় মা বলে চিৎকার করছে আর ঘণ্টা বাজাচ্ছে।

—কি বলছিস যা তা! দুশো বছর কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে! অশোক অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

—দেখ ওসব কোনো বদমাশ লোকের কাজ। গ্রামের লোককে ভয় দেখিয়ে জায়গাটা হাতাবার মতলব।

—যা বলেছিস বসন্ত। বলল অশোক।

মৈনাক বলল—চল সায়ন, আমরা নিজের চোখে ব্যাপারটা দেখে আসি। আমরা এ যুগের ছেলে এসব অন্ধ কুসংস্কার মেনে নেব যাচাই না করে তা কি হয়! যাবি?

সায়ন একটু গম্ভীর হয়ে বলল, যতটা সহজে কথাটা বললি ততটা সহজ নাও হতে পারে। জীবনের রিস্ক থাকতে পারে।

মৈনাক বলল—বল না, তুই ভয় পেয়েছিস।

সায়নের মনে লাগল, বলল—ভয় কাকে বলে সায়ন জানে না রে—আর জীবনের রিস্ক সে তো যে কোনো অ্যাডভেঞ্চারেই আছে। তাহলে তো আর নতুন কিছু করা যায় না।

—গুড়, এই তো। তুই ঠিক কর। আমরা দুজনেই যাব।

—সেই ভালো—তোরা ফিরে এলে শুনব তোদের কাছে কি ব্যাপার।

সায়ন বলল—আমি তাহলে ডিটেলস্‌টা জোগাড় করি; তবে একটা কথা, বাড়িতে বলব বেড়াতে যাচ্ছি। রক্তকালীর মাঠের কথা বলব না। ওরা তাহলে যেতে দেবে না।

রক্তকালীর মাঠ

—রক্তকালীর মাঠ! সেটা আবার কোনটা? সমস্বরে প্রশ্ন করে ওরা সকলে।

সায়ন একটু অবাক হয়ে বলে—তোদের বলেছি তো? বলিনি?—ঐ মাঠটার নামই তো রক্তকালীর মাঠ। যেখানে মন্দিরটা রয়েছে। তারপর মৈনাকের দিকে তাকিয়ে বলল—দেখ ঠিক যাবি তো?

মৈনাক বলল—নিশ্চয়ই। তুই ব্যবস্থা কর। হ্যাঁরে, তা কাপালিক কি রোজ রাতেই নরবলি দেয়—সেটা জিগ্যেস করেছিস?

সায়ন বলল—ওহো, সেটাও বলা হয়নি। রোজ রাতে পুজোর শব্দ পাওয়া যায় কিন্তু নরবলি দেয় প্রত্যেক অমাবস্যায়।

মৈনাক বলে—অশোক, বাংলা ক্যালেন্ডারে দেখ তো অমাবস্যা কবে।

অশোক দেওয়ালে টাঙানো ক্যালন্ডারটা দেখে বলে—সামনের শুক্রবার।

—বাঃ, ভাল দিন। বলল মৈনাক। আমরা বৃহস্পতিবার দুপুরে বেরিয়ে শুক্রবার রক্তকালীর মাঠে যাব। শনিবার ফিরে আসব।

সায়ন বলল—ঠিক আছে আমি রাজি। আজ মঙ্গলবার, হাতে দু'দিন সময় আছে। এর মধ্যে সব খবরাখবর নিয়ে আমরা রওনা হব। তুই বৃহস্পতিবার সকালে খাওয়া-দাওয়া করে আমার বাড়ি চলে আসিস। ওখান থেকে একসঙ্গে বেরব।

বর্ধমান লোকাল ধরে ব্যান্ডেল। কতক্ষণের বা পথ, কিন্তু কার মুখ দেখে ওরা বেরিয়েছিল কে জানে। কোথায় কি হয়েছে—তার জন্যে অবরোধ। হেন তেন করে ওরা যখন ব্যান্ডেলে পৌঁছল তখন রাত প্রায় দশটা। এরপর আর কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে রক্তকালীর মাঠে তো নয়ই। কারণ এখান থেকে মরণ খালের যা দূরত্ব তাতে যেতে গেলে ঘণ্টা তিনেক তো লাগবেই। তাছাড়া অজানা-অচেনা জায়গা, রাতের বেলা, কার কি মনে আছে কে জানে—এতটা রিস্ক নেওয়া যায় না। ওরা ঠিক করল রাতটা কোথাও কাটিয়ে ভোরবেলা যাবে। কিন্তু কোথায় কাটাবে। অল্পবয়সী ছেলে সব। হাতে তেমন পয়সাকড়িও নেই। খাওয়া-দাওয়া তো করতে হবে। সবচেয়ে ভাল হয় একটা ধর্মশালা গোছের কিছু পেলে। পয়সাকড়িও কম লাগবে, রাতটাও কাটবে।

ওরা রাস্তাতেই একটা বেঞ্চে বসে এসব আলোচনা করছিল। এমন সময় একটা মাঝবয়সী লোক এসে বলল—বাবু, থাকার জায়গা খুঁজছেন?

এই অন্ধকার রাত্রে যখন যে যার নিজের ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছে তখন হঠাৎ এই লোকটা যেন ধূমকেতুর মতো কোথা থেকে উদয় হল! লোকটার সারা শরীর সাদা চাদরে মোড়া, যেমন বাপ বা মা মারা গেলে পরে সেরকম, মুখময় খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কতদিন যে কামায়নি কে জানে। লোকটার কথা শুনে কানেকানে বলল সায়ন—সাবধান মৈনাক—মালপত্তর হাতানো লোক।

মৈনাক একগাল হেসে বলে—ভাল বলেছিস ভাই। সঙ্গে একটা প্যান্ট একটা শার্ট

আর একটা গামছা, পয়সার মধ্যে ট্রেনের টিকিটের পয়সা ছাড়া আর মাত্র সামান্য কয়েকটা টাকা খাবারের জন্যে। এ তো এরা ছোঁবেও না। ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমাদের আর ভয় কি, কথা বলে দেখ না যদি উপকার হয়।

সায়ন বলল—আজ রাতটা কাটাবার মতো ঘর চাই। কিন্তু আগেই বলে রাখছি পয়সাকড়ি ফাঁকা।

লোকটা বলল—দেখুন বাবু, আমি পয়সাকড়ি ছুঁই না। কি হবে পয়সায়, তবে আমি কোনোদিন কারো অপকারও করিনি। রাত্তিরটায় মানুষ বেশি ঝামেলায় পড়ে বলে আমি এই রাত্তিরে ঘুরে বেড়াই। আপনাদের দেখে মনে হল আশ্রয় চাই। স্কুলের ছেলেরা খরচ করার মতো পয়সাই বা পায় কোথায়। তাই এলাম বলতে। আমার একটা ছোট্ট কুঠুরি আছে। সেখানে দুটো দিন অনায়াসে আপনারা কাটাতে পারবেন। কোনো পয়সাকড়ি লাগবে না।

হাতে স্বর্গ পেল যেন সায়ন আর মৈনাক। কিছু না ভেবেই ওরা এক কথায় রাজি হয়ে গেল। যদি ওরা লক্ষ্য করতো দেখতে পেত লোকটার চোখ দুটো আনন্দে আগুনের মতো জ্বলছে। একটা অটো ডেকে ওরা উঠে বসল। কিন্তু কত দূর। চলছে তো চলছেই। পথ যেন আর শেষ হয় না। হাতঘড়িতে সায়ন দেখল রাত প্রায় বারোটা। ও না বলে পারল না—কি ব্যাপার বলুন তো, কত দূরে আপনার বাড়ি?

—এই তো সামনে, গ্রামের শেষ প্রান্তে আমার বাড়ি। তারপরই শুরু হচ্ছে রক্তকালীর মাঠ।

আঁতকে উঠল মৈনাক আর সায়ন—রক্তকালীর মাঠ! তার কাছে ওরা এসে পড়েছে। গাড়িটা থেমে গেল। ওরা নামল। একটা একচালা দাওয়াওলা কুঠুরি। লোকটা অটোটাকে ভাড়া দিয়ে দিল। মৈনাক আর সায়ন দুজনে টাকা দিতে গেল। লোকটা নিল না। বলল—যাবার সময় দিয়ে যেও। এখন ঘরে যাও। মৈনাক আর সায়ন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ঘরে গেল। সমস্ত শরীরটা যেন নিজেদের বশে নেই। লোকটা ঘরের মধ্যে একটা প্রদীপ দিয়ে গেল। বলল—শুয়ে পড়, রাত হয়েছে। কাল তোমরা রাত্তিরে মন্দিরে যেও।

লোকটা বেরিয়ে গেল। ঘরের দরজাটা বোধহয় বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল।

মৈনাক বলল—আমরা এ কার পাল্লায় পড়লুম রে!

সায়ন বলল—ভয় কি, আমাদের তো আর কিছু হারাবার নেই রে। দেখা যাক না কী হয় শেষ পর্যন্ত। কাল আমরা মাকে দর্শন করে পালিয়ে যাব।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল সায়নের। প্রচণ্ড জলতেষ্টা পাচ্ছে। সঙ্গে টর্চ ছিল। সেটা জ্বেলে ঘরের চারদিক খুঁজে দেখল সায়ন। কোথাও কুঁজোটুজো কিছুই নেই। অথচ দরজা বন্ধ। লোকটাকে গিয়ে যে বলবে জলের কথা তার কোনো উপায় নেই। কি

মনে করে ও আর একবার চেষ্টা করল দরজাটা খুলতে। আশ্চর্য হাত দিতেই দরজাটা খুলে গেল। বাইরের দাওয়ায় লোকটা বসে ছিল অত রাতে। ঘুমোয় না নাকি! সায়নকে দেখে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল—ঘরের মধ্যে কুঁজো আছে, জল খেতে পার।

সায়ন জোর দিয়ে বলল—কই নেই তো। আমি দেখেছি।

লোকটা এক ধমক দিয়ে বলল—আছে। আমি বলছি আছে। দেখ গিয়ে।

ওর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল সায়ন আর কথা বাড়াল না। ঘরে এল। আর আশ্চর্য, ঘরে এসে দেখল—কুঁজো আছে, এবং তাতে জলও ভর্তি আছে। সায়ন মনে করল একবার মৈনাককে ডাকে, ব্যাপারটা বলে, কিন্তু মৈনাক এত গভীর ঘুমচ্ছে যে ওকে ডাকতে ওর মায়া হল। আবার বিছানায় শুয়ে পড়ল সায়ন। কিছুতেই ঘুম আসছে না। ভাবল লোকটা তো জেগেই আছে, ওর সঙ্গে একটু গল্প করে কাটিয়ে দিলে কেমন হয়। সায়ন বেশ কিছুক্ষণ ধরে এপাশ-ওপাশ করে আবার বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়? চারদিকে বনবাদাড়। ঝিঁঝিঁ পোকার তীব্র শব্দ, তার সঙ্গে হুহু করে বয়ে চলা ঝোড়ো বাতাসের শব্দ। তার মধ্যে সে শুনতে পেল কে যে বলছে সায়ন মৈনাক.....সায়ন মৈনাক.....সায়ন মৈনাক। অবাক হয়ে গেল সায়ন। কে যেন তাদের ডাকছে। হঠাৎ ও লক্ষ্য করল মৈনাক ঘুমন্ত অবস্থায় উঠে বসল। ও ডাকল, মৈনাক.....।

কোনো সাড়া পেল না। মৈনাক উঠল, তারপর ঘুমের ঘোরে এগিয়ে চলল বনের দিকে। সায়ন খুব সজাগ কিন্তু মৈনাক কোথায় যাচ্ছে দেখার জন্যে ও মৈনাককে অনুসরণ করে চলল। দূরে এক জায়গায় আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের সামনে লোকটা বসে আছে আর বিড়বিড় করে কিসব বলছে। ওদের দিকে পেছন করে বসে আছে কালো মিশমিশে একটা দৈত্যের মতো লোক। সায়ন ঠিক বুঝতে পারল না ব্যাপারটা। কিন্তু দেখল মৈনাক প্রায় আগুনের কাছে চলে গেছে। ও সব ভুলে চিৎকার করে উঠল—মৈনাক যাসনি রে।

চমকে ফিরে তাকাল মৈনাক। সায়নকে দেখে অবাক হয়ে জিগ্যেস করল—আমি কোথায় রে?

সায়ন বলল—সামনে তাকিয়ে দেখ.....কিন্তু সায়নের কথা শেষ হল না, সায়ন নিজেই অবাক হয়ে গেল। আশ্চর্য, আগুনও নেই লোকটাও নেই। তাহলে সে কি এতক্ষণে স্বপ্ন দেখছিল! আর মৈনাকই বা কেন এখানে এল! মৈনাক বলল—জানিস আমায় কে যেন ডাকছিল আয় আয় করে।

সায়নের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে নানারকম ঘটনায়। বলল—ঘরে চল মৈনাক। এখানে বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক হবে না।—

ওরা কুঠুরিতে ফিরে এল। সেখানে আর এক বিস্ময়। ওরা দেখল দাওয়ায় শুয়ে লোকটা ঘুমচ্ছে। মৈনাক আর সায়ন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

তারপর ঠিক করল সকাল হলে একটু ফাঁক বুঝে ওরা পালাবে, কিন্তু সে সুযোগ আর কিছুতেই পাচ্ছিল না। ঘরে ঢুকল লোকটা একগাদা লুচি, তরকারি আর মোহনভোগ নিয়ে। কাল থেকে ওরা প্রায় অভুক্ত। খাবার দেখে ভাবল—আগে তো খেয়ে নিই তারপর পালাব। আবার ভুল করল ওরা। পেট পুরে খেল। দারুণ সুস্বাদু খাবার। বড় তৃপ্তি হল খেয়ে। কিন্তু তারপর আর ওদের কিছু মনে নেই। সন্ধের পর ওদের ঘুম ভাঙল। সায়ন বলল, সব জামাকাপড় এখানে থাক। ওসব নিয়ে পালাতে গেলে ধরা পড়ে যাব। তারচেয়ে এই সুযোগ। চল, মায়ের মন্দিরে যাই। ওখানে নিশ্চয়ই লোকজন থাকবে। আমরা বেঁচে যাব।

ভাবামাত্র কাজ। সৌভাগ্যের কথা লোকটা ওদের দেখতে পায়নি। ওরা ছুটতে ছুটতে সোজা রক্তকালীর মাঠের ভেতর মন্দিরের সামনে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পুরোহিত পুজোর জোগাড় করছেন। দু'চার জন গ্রামের লোক দাঁড়িয়ে পুজো দেখবে বলে। ওরা ওদের সঙ্গে মিশে গেল। কিন্তু চমকে উঠল মায়ের মূর্তির দিকে তাকিয়ে। ওঃ সে কি ভয়ঙ্কর মূর্তি! একপিঠ কালো ঘন অন্ধকারের মতো চুল এলিয়ে আছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রং। সম্পূর্ণ উলঙ্গ দেবী। প্রায় পাঁচফুট লম্বা। টকটকে লাল জিভ, টকটকে লাল চোখ। গলায় সারি সারি নরমুণ্ড মালা। প্রত্যেকটি কাটামুণ্ড যেন জীবন্ত—তাদের গলা দিয়ে টপটপ করে রক্ত পড়ছে আর সেই রক্ত খাচ্ছে এক শ্মশানচারি শিয়াল। তার লম্বা জিভ দিয়ে টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়ছে। আর শিয়ালের দাঁতগুলোও কেমন লাল। মনে হয় রক্ত লেগে আছে। কিন্তু ভাল করে দেখে ওরা বুঝতে পারল ওরকম মনে হলেও সত্যি কিন্তু জীবন্ত নয়।—ঠিক মন্দিরের চাতালে একটা হাঁড়িকাঠ। চমকে উঠল সায়ন। এ সে কি দেখছে! সায়নের সাড়াশব্দ না পেয়ে মৈনাক সায়নের দিকে তাকাল তারপর ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল ঐ হাঁড়িকাঠের দিকে। সাংঘাতিক চমকে উঠল মৈনাক। চাপাস্বরে সায়নকে বলল—আমি এসব কি দেখছি রে? এ তো রক্তগঙ্গা বইছে। আমি ভুল দেখছি না তো? তাহলে কি এইমাত্র বলি দেওয়া হয়েছে? চল তো, ভাল করে দেখি। সায়ন মৈনাকের কথার কোনো উত্তর দিল না। পায়ে পায়ে হাঁড়িকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল হাঁড়িকাঠ থেকে রক্ত গড়িয়ে সরু ধারায় বয়ে চলেছে খালের দিকে। যে জায়গাটায় এসে পড়ছে সেখানকার অনেকখানি জায়গা ঘিরে লাল জল। হঠাৎ আরতি শুরু হল। কাঁসর-ঘণ্টার শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল নিস্তব্ধ রক্তকালীর মাঠ। মৈনাক আর সায়ন দাঁড়িয়ে থাকা একজন মানুষকে জিগ্যেস করল, বলি হল বুঝি? কাঁসর ঘণ্টার শব্দে সে শুনতে পেল না। তখন ইশারায় হাঁড়িকাঠটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, বলি হল?

লোকটা তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের ইশারায় চুপ করতে বলল। তারপর হাত নেড়ে বলল—পরে হবে। পরে বলব।

আরতি শেষ হল। এবার ভোগের ব্যবস্থা। মিনিট পনেরোর জন্যে মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। তারপর আবার দরজা খুলে ভোগ বিতরণ হবে। এই পনেরো মিনিট সময় সবাই দাঁড়িয়ে থাকবে। লোকটা ওদের দিকে এগিয়ে এসে বলল—কি জানতে চান তাড়াতাড়ি বলুন। সময় খুব কম।

কিসের সময় কম, কেন কম এ সব বুঝতে পারল না ওরা।

তবে বুঝতে পারল যা কিছু তাড়াতাড়ি করা দরকার। মৈনাক বলল—এক্ষুনি কি বলি হয়েছে?

লোকটা একটু ভেবে বলল—শেষ বলি হয়েছে ছ'মাস আগে কালীপূজার রাত্তিরে, পাঁঠাবলি।

সায়ন চোখ বড়বড় করে বলে—ছ'মাস আগে! কিন্তু এখনও রক্ত বইছে—কী বলছেন?

লোকটার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল। কপালে হাত ঠেকিয়ে মায়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বলল—এ রক্ত কখনও শুকোয় না।

—সে কি! মৈনাক বলল—এ তো অসম্ভব কথা।

লোকটা একটু রাগত স্বরে বলল—নিজের চোখেই তো সব দেখলেন। সন্দেহ করবেন না। যা বলছি মেনে নিন। শুনুন, আগে হত নরবলি—তারপর মোষ, তারপর পাঁঠা। আপনারা এখানে নতুন?

ওরা দুজনেই মাথা নেড়ে জানাল ওরা নতুন। লোকটা বলল—তাহলে শুনে রাখুন বেশি কৌতূহল ভাল নয়। আর যতটা শীঘ্র সম্ভব চলে যান। আমরাও এখুনি সকলে চলে যাব।

—কিন্তু কেন—? মৈনাকের প্রশ্নের উত্তরে কী যেন বলতে গেল লোকটি। কিন্তু মন্দিরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল। শুধু বলল, আসুন, পুরোহিত ঠাকুর প্রসাদ দিচ্ছেন।

লোকটির সঙ্গে সঙ্গে ওরাও এগিয়ে গেল। সকলের হাতে একটু করে প্রসাদ দেওয়া হল। একটা করে লুচি আর তাতে অল্প মোহনভোগ। এই প্রসাদের স্বাদ ওরা এর আগেও পেয়েছে। কুঠুরির লোকটা তাদের খাইয়েছিল। ওরা প্রথমটা ইতস্তত করছিল তারপর যখন দেখল সবাই খাচ্ছে ওরাও খেল। সায়ন বলল—আমাদের যে তরকারি দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। এটায় ওসব নেই।

সায়ন কথা বলছে। মৈনাক চোখ বড় বড় করে কি যেন দেখছে। সায়ন বলল—কি দেখছিস?

মৈনাক বলল—লক্ষ্য কর মায়ের খাঁড়াতেও রক্ত লেগে।

সায়ন বলল—তাই তো। ঠিক বলেছিস।

মৈনাক বলল—আর একটা জিনিস লক্ষ্য কর।

সায়ন বলল—কি বল তো?

মৈনাক বলল—দেখ পুজোর পর আবার নতুন করে আরতির জিনিস সাজানো হয়েছে। থালায় ফুল-বেলপাতা দিয়ে নতুন করে জোগাড় করা হয়েছে।

সায়ন বলল—দূর এ আবার কি দেখব! ও তো কাল সকালের জোগাড়।

মৈনাক মাথা নেড়ে বলল—হতে পারে। কিন্তু ফুল-বেলপাতা সব তো শুকিয়ে যাবে কাল সকালে। ওতে তো কোনো চাপাও দেওয়া হয়নি।

প্রায় সবাই এক এক করে চলে যাচ্ছে। পুরোহিত মন্দিরের দরজা বন্ধ করার আগে ওদের ডাকলেন।—

—তোমরা কে? এর আগে তো কখনও দেখিনি। কোথা থেকে এসেছ?

মৈনাক বলল—আমরা কলকাতা থেকে এসেছি। মায়ের মহিমা শুনে দর্শন করতে এসেছি। শুনেছি উনি নাকি খুব জাগ্রত।

পুরোহিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ওদের দিকে। সে দৃষ্টির সামনে ওরা যে কেমন হয়ে গেল। ওদের মনে হল পুরোহিত তাদের মনের মধ্যে ঢুকে যেন আসল সত্যটাকে হাতড়াচ্ছেন। ওরা ভীষণ একটা অস্বস্তিতে পড়ল। অনেকক্ষণ পরে পুরোহিত বললেন—শোন, তোমরা ফিরে যাও। রাত নটার পর আর এখানে কারো থাকার নিয়ম নেই। আর যদি সেটা না মান—মনে রেখো বড় একটা ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

সায়ন বলল—আমরা ফিরে যাব। আপনি যান।

চোখে সন্দেহ নিয়ে পুরোহিত বললেন, গেলেই মঙ্গল।

পুরোহিত চলে যেতে মৈনাক বলল—কি বলল শুনলি?

সায়ন বলল—না গেলে নাকি আমাদের ক্ষতি হবে। আমরা এ যুগের ছেলে হয়ে মেনে নেব এসব অলৌকিক? মানা যায় না। বলল সায়ন। আমার কি মনে হয় জানিস, কিছু ধান্দাবাজ লোক এসব করছে। লাল রং ঢেলে রক্ত বলে ভয় দেখাচ্ছে। নিশ্চয়ই ওদের কিছু মতলব আছে।

মৈনাক—আমারও তাই মনে হয়, কিন্তু বদমাশ লোকের পাল্লায় পড়লে তো বেঘোরে প্রাণটাও যেতে পারে। তা যাক, এসেছি যখন এর শেষ দেখে ছাড়ব।

সায়ন—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। রাত নটার পর কি হয় দেখতেই হবে। নয়তো বসন্ত, অশোক, সব বলবে— কী ভীতু রে তোরা। ভয়ে পালিয়ে এলি!

মৈনাক বলল—সামনের গাছটা দেখছিস? একগাদা ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কয়েক বছর ধরে। ওর ডালেই আমরা লুকোই। কেউ দেখতে পাবে না—যা দেখার

দেখব। অবশ্য সত্যি যদি কিছু ঘটার মতো ঘটে। তারপর ভোরবেলা সবার আড়ালে লুকিয়ে পালাব। কি রে তুই রাজি তো?

—একদম এককথায় রাজি। বলল সায়ন। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া.....

বাদ দে তো, সকালে যা খেয়েছি এখনও পেট ভার আছে। একদিন না খেলে কী হবে। চল গাছে উঠে পড়া যাক। এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক হবে না।

দুইজনেই বিশাল বড় বটগাছের এক শক্ত ডালে গিয়ে বসল, বেশ শক্ত করে ধরে রাখল নিজেদের। রাত বাড়তে লাগল। ওরাও মাঝেমধ্যে ছটফট করতে লাগল। নিজেদের মধ্যে কথা বলাও বন্ধ। কিন্তু ঘুম কাটবে কি করে! চোখ তো জড়িয়ে আসছে। আর গত রাতে তো ভাল করে ঘুমতেই পারেনি ওরা। তাই ঘুম পাওয়াটা আশ্চর্যের কিছু নয়। দুজনেরই একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল। হঠাৎ শুনতে পেল খস্‌খস্‌ শব্দ। ওরা দুজনে দুজনের দিকে তাকাল। মৈনাক চারদিক উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। সায়নও চেষ্টা করল কিন্তু কেউ কিছু দেখতে পেল না। খানিক পরে দেখল একজন বীভৎস-দর্শন লোক আর একটা লোককে হাত পা মুখ বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। লোকটার মুখটা বাঁধা বলে লোকটা চেঁচাতেও পারছে না। শুধু একটা গোঁ গোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছিল। যে লোকটা ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তার মুখটা বোঝা যাচ্ছিল না ভাল করে। একমাত্র কালো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল একমাথা হয়ে লোকটার মুখের অর্ধেকটা ঢেকে রেখেছিল। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল লোকটা কাপালিক। মৈনাক বলল—ঐ সেই কাপালিক। সায়ন মাথা নাড়ল, কথা বলল না।—হ্যাঁ, কাপালিক তো বটেই। গলায় কত বড় বড় রুদ্রাক্ষের মালা, আর হাতে রুদ্রাক্ষের বালা পরা। লাল রং-এর কাপড়। কিন্তু সঙ্গের লোকটাকে ওদের মনে হল কোথায় যেন দেখেছে। সায়ন ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বলল—চিনেছি।

মৈনাক বলল, আস্তে, চেঁচাসনি—কে বল তো?

সায়ন বলল—ভাল করে লক্ষ্য কর—এই লোকটাই আমাদের কুঠুরিতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল না?

—ঠিক তো! মৈনাক বলল।

ওরা দেখল—কাপালিক লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। ওঃ কী সাংঘাতিক শক্তি ধরে লোকটা!

কাপালিক লোকটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে মরণ খালের জলে বেশ করে তিনবার চোবাল। তারপর আবার সেই অবস্থায় নিয়ে গেল মায়ের মন্দিরের দরজার কাছে।

লোকটাকে শুইয়ে দিয়ে কাপালিক চিৎকার করে উঠল—মা—মা—মাগো.....। ওঃ সে কী কান-ফাটানো চিৎকার! সমস্ত গাছটা যেন সেই শব্দে কেঁপে উঠল। তারপর

কাপালিক ঐ লোকটার দিকে ফিরে প্রচণ্ড রেগে বলল—তুই কথা দিয়েছিলি দুটো নতুন বলি এনে দিবি, পারিসনি, তাই মায়ের কাছে আজ তোকেই বলি দেব। বলি বন্ধ হবে না, বুঝলি। জয়.....মা....।

আবার সেই চিৎকার। সায়ন তাকাল মৈনাকের দিকে। এতক্ষণে বোঝা গেল ওদের ঘরের মধ্যে আটকে রাখার চেষ্টা বা মন্ত্র পড়ে সম্মোহন করার চেষ্টা কেন করেছিল লোকটা। বুকের মধ্যে থরথর করে কাঁপছে মৈনাক আর সায়নের। কত বড় বিপদ হতে যাচ্ছিল তাদের। এখনও তো ওরা বিপদমুক্ত নয়। একবার যদি ওরা দেখতে পায় তাদের সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে নামিয়ে বলি দেবে।

কাপালিকটা মায়ের পুজোর ফুল নিয়ে প্রথমে মাকে পুজো করল। তারপর সেই প্রসাদী ফুল ছিটিয়ে দিতে লাগল লোকটার গায়ে। এই জন্যে পুরোহিত পুজোর জোগাড় করে রেখে গেছেন। ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওদের কাছে। কাপালিক মায়ের পায়ে অঞ্জলি দিল জবাফুলের গোছা। গাছের ওপর থেকে সব নজরে পড়ছে ওদের। কিন্তু কাপালিকের মুখটাই দেখতে পাচ্ছে না। কাপালিক আর একবার চিৎকার করে উঠল মা মা বলে। তারপর ধূপ-ধুনো জ্বেলে পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে শুরু করল আরতি। ঘণ্টার শব্দ আর কাপালিকের মা মা ডাক চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। গাছের ওপর বসে প্রচণ্ড ভয় আর উত্তেজনায় কাঁপছে ওরা। পাছে পড়ে যায় তাই প্রাণপণে চেপে ধরে আছে গাছের ডাল। আরতি শেষ হল। কাপালিক হাত-পা বাঁধা লোকটাকে কাঁধে ফেলে নিল। লোকটা মুক্তির চেষ্টায় গোঁ গোঁ শব্দ করছে আর ছটফট করছে। কিন্তু কাপালিকের শক্তির কাছে একেবারে অসহায় সে। কাপালিক কাঁধে তুলে নিল লোকটাকে। অবলীলাক্রমে তাকে নিয়ে চলল হাঁড়িকাঠের কাছে। হাঁড়িকাঠের মধ্যে তার গলাটা ঢুকিয়ে কাঠটা আটকে দিল। লোকটা ভীষণ ভাবে ছাড়া পাবার চেষ্টা করছে। বুঝিবা মাটি সমেত হাঁড়িকাঠটাই উপড়ে যায়। কাপালিক গ্রাহ্য করল না। ফিরে গেল মন্দিরে। ডান হাতে মায়ের খাঁড়াটা নিল আর বাঁ হাতে নিল মড়ার খুলি। খাঁড়াটা অন্ধকারেও চকচক করছে। সেটাকে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে কাপালিক এগিয়ে চলল হাঁড়িকাঠের দিকে। মুখে সেই এক ডাক—মা—মা। তারপরই হাঁড়িকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে মড়ার খুলিটা লোকটার মাথা বরাবর লক্ষ্য করে একটু দূরে রাখল। তারপর দু'হাতে খাঁড়াটা মাথার ওপর তুলে জয়-মা বলে এক কোপে বসিয়ে দিল লোকটার গলা লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে সেই গগনভেদী চিৎকার—জয়-মা। খাঁড়া নেমে এলো আর সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ডুটা ছিটকে পড়ল বিলের জলের কাছে, আর ধড়টার সে কি ছটফটানি। মৈনাক বুঝিবা অজ্ঞান হয়ে যাবে। সায়ন বুঝতে পেরে এক হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে মৈনাককে। ওর নিজেরও শরীর খারাপ লাগছে কিন্তু মন দুর্বল করলে আর রক্ষে নেই, প্রাণটা যাবে। তাই মনকে শক্ত করে বসে রইল। এরপর

কাপালিক যা করল তা আরও বীভৎস। ধড় থেকে যে রক্ত ফিনকি দিয়ে পড়ছিল সেটা মড়ার খুলিতে সংগ্রহ করল। সেই খুলিটা নিয়ে মায়ের পায়ে ঠেকিয়ে বলল—নে মা রক্ত পান কর মা। তুই তৃপ্ত হ মা।

বলতে বলতে নিজেই সেটা খেয়ে নিল। মৈনাক আর পারল না, ঢলে পড়ল সায়নের গায়ে। সায়ন প্রাণপণ চেষ্টায় মৈনাকের দেহটা চেপে বসে রইল। কিন্তু কতক্ষণ পারবে সে বসে থাকতে তাতে ওর সন্দেহ ছিল। শরীরটা ক্রমশ ভার হয়ে আসছে। কিন্তু কাপালিক চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওকে থাকতেই হবে এই অবস্থায়। কিন্তু আর যে পারছে না। যে কোনো মুহূর্তে মৈনাককে নিয়ে ও পড়ে যাবে। চোখটাও যেন কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। ও দেখতে চেষ্টা করল কাপালিক কোথায়—। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখারও উপায় নেই। বুঝতে পারল না কাপালিক চলে গেছে কিনা। হঠাৎ মনে হল গ্রামের ভেতর থেকে কোনো মোরগ ডেকে উঠল। তবে কি ভোর হচ্ছে! জীবনে সায়ন যা কোনোদিন করেনি আজ তাই করল। ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল—হে ঈশ্বর, জানি না কত পাপ করেছি জীবনে। কোনোদিন তোমাকে ভাল করে ডাকিওনি। যদি সত্যি তুমি থাক—রক্ষা কর—ভগবান রক্ষা কর আমাদের।

আবার মোরগ ডাকল সেই মুহূর্তে। এবার নিশ্চিত সায়ন। ভোর হচ্ছে—আর ভয় নেই। মনে হতেই হাতের জোর আলগা হয়ে গেল আর মৈনাককে জড়িয়ে সায়ন গাছের ওপর থেকে পড়ে যেতে লাগল নীচেতে। ডালপাতায় ভরা বিশাল গাছ। ওদের দেহটা ধাক্কা খেতে খেতে পড়তে লাগল মাটিতে। লুটিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সায়ন দেখল একটা বীভৎস মুখ ওর দিকে তাকিয়ে আছে। মানুষের মুখ যে এত বিশাল আর বীভৎস হতে পারে বা অত ভয়ঙ্কর হতে পারে তার কোনো ধারণাই ছিল না সায়নের। চোখ দুটো কোটরগত, যেন কঙ্কাল। চোখের ওপরের ভ্রূ দুটোর ওপরের লোমগুলো লম্বা হয়ে এসে চোখের ওপরটা প্রায় ঢেকে ফেলেছে, বিশাল হাঁ-মুখ, আফ্রিকানদের মতো চওড়া চওড়া দুটো ঠোঁট। মুলোর মতো দাঁত, তার মধ্যে আবার দুটো দাঁত কুকুরের দাঁতের মতো তীক্ষ্ণ। এ যেন সেই রক্তচোষা ভ্যামপায়ার। তারপর কি হল সায়নের আর মনে নেই।

যখন জ্ঞান ফিরল দেখল চারদিকে তাকে কত লোক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। আর পাশেই বসে আছে ক্লান্ত বিধ্বস্ত মৈনাক। আশেপাশের মানুষরা বলল—কি দাদা, ভাল আছেন তো এখন? আমরা ভোরবেলা কাজে বেরিয়ে দেখলাম আপনারা দুজনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। কি করে এমন হল?

মৈনাক বলল—দুজনেরই শরীরটা একটু খারাপ ছিল, কিছু ভাববেন না। আমরা ঠিক চলে যাব। আজই কলকাতায় ফিরে যাব। আপনারা যান। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন বলে।

আশেপাশের লোকেরা চলে যেতে সায়ন বলল—আমাদের ব্যাগ দুটো পড়ে আছে ঐ লোকটার ঘরে।

কিন্তু লোকটা তো আর নেই। চল জামাকাপড়গুলো নিয়ে পালাই।

মৈনাক বলল—হ্যাঁ, তাই চল। ব্যাগে শুধু জামাকাপড়ই নয় ওর ভেতর কিছু টাকাও আছে। সরিয়ে রেখেছিলাম পরে দরকার হলে নেব বলে।

সায়ন বলল—চল তাহলে। জিনিস দুটো নিয়ে পালাতে হবে। কাল কাপালিকটা কি বলছিল তোর মনে নেই?

—কি বলেছিল বল তো?

মৈনাক বলল—বলছিল দুটো নতুন বলি আনবি বলেছিলিস না! কি হল? ঠিক আছে। যতদিন না নতুন বলি পাওয়া যায় তোকেই মায়ের সামনে বলি দেব বুঝলি।

সায়ন বলল—তাহলে মনে হয় কাপালিক আজ আমাদের খুঁজে বার করবেই করবে। তারচেয়ে পালানো বুদ্ধিমানের কাজ।

ওরা কুঠুরির দরজার সামনে এলো। চারদিক একবার দেখে নিল। তারপর সোজা ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। দুটো ছোট ছোট কাঁধ-ব্যাগ। তুলে চট্ করে বেরোতে যাবে হঠাৎ দুজনে ভূত দেখার মতো চিৎকার করে উঠল। তাদের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে কুঠুরির মালিক। যে লোকটাকে ওদেরই চোখের সামনে এক কোপে কেটে কাপালিক রক্ত খেল। লোকটার হাতে এক প্লেট লুচি-তরকারি। এসে মাটিতে রেখে বলল—নাও, সব খেয়ে নাও। চিন্তা কোর না, আজ রাতে তোমাদের আমি নিজে নিয়ে যাব মাতৃদর্শনে। তারপর লোকটা চলে যেতে যেতে আর একবার পেছনে ঘুরে তাকাল। দাঁড়িয়ে গেল। বলল—আর একটা কথা, তোমরা কিন্তু কাল রাত্তিরে ঘরে শোওনি। আমি এসে ফিরে গেছি। একেবারে তোমাদের দেখতে পেলুম গাছতলায়। কি করছিলে গাছে বসে?

ভাগ্য ভাল। উত্তর শোনার জন্যে আর দাঁড়াল না লোকটা। কিন্তু মৈনাক আর সায়নের তো আবার অজ্ঞান হয়ে যাবার মতো অবস্থা হল। এ কি করে সম্ভব! কাল রাতে কি তবে ওরা অন্য লোককে দেখল? না না—তা কি করে সম্ভব! ওরা দুজনে একসঙ্গে ভুল দেখতে পারে না।

কথাটা বলে চলে যায় লোকটা। আর সঙ্গে সঙ্গে খুট করে শব্দ। তার মানে এবারও ওরা বন্দি হল লোকটার হাতে। মৈনাক বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ওদের কথা ভেবে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। বলল—সায়ন, আমাদের আর ফেরা হল না রে।

সায়ন ধমক দিয়ে বলল—এ তুই কি করছিস মৈনাক! মনকে শক্ত কর। উপায় বার কর, এভাবে বেঘোরে প্রাণ দেব বলে মনে করিস না। হঠাৎ সায়নের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ওর মুখে হাসি ফুটল। দেখা গেল প্ল্যানের কথা শোনার

প'র মৈনাকের মুখেও আশার আলো ফুটে উঠল। সায়ন বলল—আমার খাবারগুলো খেয়েছি কিনা দেখার জন্যে লোকটা ঠিক ঘরে ঢুকবে আর একবার।

সায়নের কথা ঠিক হল। খানিক পরে লোকটা ঘরে ঢুকল। দেখল সব খাবার পড়ে আছে। ওরা কিছু খায়নি। সায়ন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিল। লোকটার যখন খাবারের দিকে নজর সেই সময় ও দরজা খোলা পেয়ে পালাল। লোকটা পরক্ষণেই খোঁজ করল। মৈনাককে বলল—অন্যটা কোথায়?

মৈনাক বলল—কি জানি, এখানেই তো ছিল।

লোকটার চোখ দিয়ে আগুন বেরোতে লাগল। বলল—পালিয়ে যাবে কোথায়। —আমার হাত থেকে ওর নিস্তার নেই। বলেই দরজটা বাইরে থেকে আবার বন্ধ করে ছুটল সায়নের সন্ধানে। ঘরের মধ্যে বন্দি মৈনাক ভগবানকে ডাকছে। সায়নের সহায় হও ঠাকুর, কেন যে তারা জামাকাপড়ের লোভে আবার এসে লোকটার ফাঁদে পা দিল!

সায়ন ছুটছে প্রাণপণে। দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছে। সামনে লোকালয়। ওকে সেখানে পৌঁছুতেই হবে। ও পরিষ্কার পায়ের শব্দ আর ডাক শুনতে পাচ্ছে লোকটার। লোকটা বলছে—না এলে মরবি। ফিরে আয়—বলছি।

কোনোদিক কান না দিয়ে সায়ন ছুটছে, ক্রমশ গলার স্বর যেন অনেক কাছে এসে পড়েছে বলে মনে হল, বুঝি বা ধরে ফেলে, ঠিক সেই সময় সায়ন দেখল একটা চায়ের দোকান। সেখানে বেশ ক'জন মানুষ গল্পগুজব করছে। সায়ন ছুটতে ছুটতে গিয়ে ওদের সামনে দড়াম করে পড়ে গেল। সবাই দৌড়ে এল। কি হয়েছে, কি হয়েছে? সায়ন চিৎকার করে বলল—তোমরা আমাকে বাঁচাও। ঐ লোকটাকে ধর।

সবাই অবাক হয়ে দেখল কেউ নেই। বলল—কোথায় লোক? কি ব্যাপার বল তো খুলে।

হ্যাঁ। সবকথা খুলেই বলল সায়ন। আগাগোড়া।

সেই কলকাতা থেকে গল্প শুনে বেরনো থেকে শুরু করে এই মুহূর্তের কথা। কোনো কথাই গোপন করল না। তারপর প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলল—আপনারা সব শুনলেন এখন আমার বন্ধু মৈনাককে বাঁচান।

বয়স্ক কয়েকজনের মুখে-চোখে ফুটে উঠল আতঙ্কের চিহ্ন। বলল—আপনি কি বলছেন আপনি জানেন? আপনি যা বললেন—তা তো দেড়শো-দুশো বছর আগের ঘটনা। রক্তকালীর মাঠে মায়ের মূর্তি পূজা করত ঐ রকম একজন কাপালিক। সে নরবলি দিত আর নররক্ত ছিল তার পূজা-উপাচার. কারণবারি। আর যে লোকটার কথা বললেন—ঐখানেই ঐ একটাই বাড়ি ছিল। সেখানে বাস করত এক চাষা। তার ছেলে-বৌ নিয়ে থাকতো। একদিন কাপালিক লোকটার ছেলেকে বলি দিল। তারপর

চাষাকে। লোকটার বউটা শোকে পাগল হয়ে মরেই গেল। লোকে বলে লোকটা নাকি ভূত হয়ে ভিটে পাহারা দেয় আর নতুন লোক দেখলে টেনে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে ঘরে। তারপর কি হয় কে জানে, তাদের আর খুঁজে পাওয়াই যায় না।

—তাহলে মৈনাককে বোধহয় এতক্ষণে ও মেরে ফেলেছে। কি করে মুখ দেখাব ওর বাবা-মায়ের কাছে! হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল সায়ন।

লোকেরা নিজেদের মধ্যে কি সব বলাবলি করল। তারপর হাতে একটা করে লাঠি নিয়ে বলল—চলুন তো, দেখি কি হয়। ভগবান ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারবে না আপনার বন্ধুকে।

হৈচৈ করে খুব ছুটতে ছুটতে এলো ওরা। কিন্তু কোথায় কি!

বাড়ি-ঘর-চালা কোথাও কিছু নেই। মৈনাক কোথায়?

তবে কি তাকে মেরে ফেলল? চিৎকার করে উঠল সায়ন, মৈনাক—মৈনাক—সাড়া দে ভাই।

হঠাৎ এক গ্রামবাসী বলে ওঠে—এই দ্যাখ তো, এখানে কে যেন পড়ে আছে। সায়ন ছুটে গিয়ে দেখল মৈনাক। আবার জ্ঞান হারিয়েছে। একটা ঝোপের মধ্যে পড়ে আছে মৈনাক। বেশ খানিকক্ষণ পর জ্ঞান ফিরতে সায়ন মৈনাককে জিগ্যেস করল—তুই এখানে কি করে এলি?

মৈনাক ধুঁকছে। বড় ক্লান্ত। তবু বলল—তুই বেরিয়ে যাবার পর লোকটাও গেল। খানিক পরে ফিরে এসে চোখ পাকিয়ে বলে উঠল—ঠিক আছে। দুটো না হয়—একটাকে আজ মায়ের কাছে বলি দেব।

তারপর লোকটার চেহারাটা বদলে হয়ে গেল একটা পিশাচের মতো। বড় বড় দাঁত বার করে দু'হাতে আমাকে ধরতে এলো। আমি ওর হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছিলাম এমন সময় খুব হৈচৈ-এর শব্দ। লোকটা এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু যাবার আগে খুব জোর একটা ধাক্কা খেলাম। ছিটকে পড়লাম কোথায় কে জানে। মনে হল একটা শক্ত কিছু লাগল আমার মাথায়। আমার জ্ঞান চলে গেল। তারপর আর কিছু জানি না।

সায়ন দেখল মৈনাকের কপালটা নীল হয়ে ফুলে উঠেছে। ট্রেনে উঠে সায়ন বলল—দেখ, আমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। কাউকে কিছু বলিস না। দেড়শো-দুশো বছর ধরে কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে একথা এযুগে বিশ্বাস করবে না এটাই তো স্বাভাবিক। তাই না?

মৈনাক মাথা নাড়ল। কোনো কথা বলল না।

———————

অতিথি

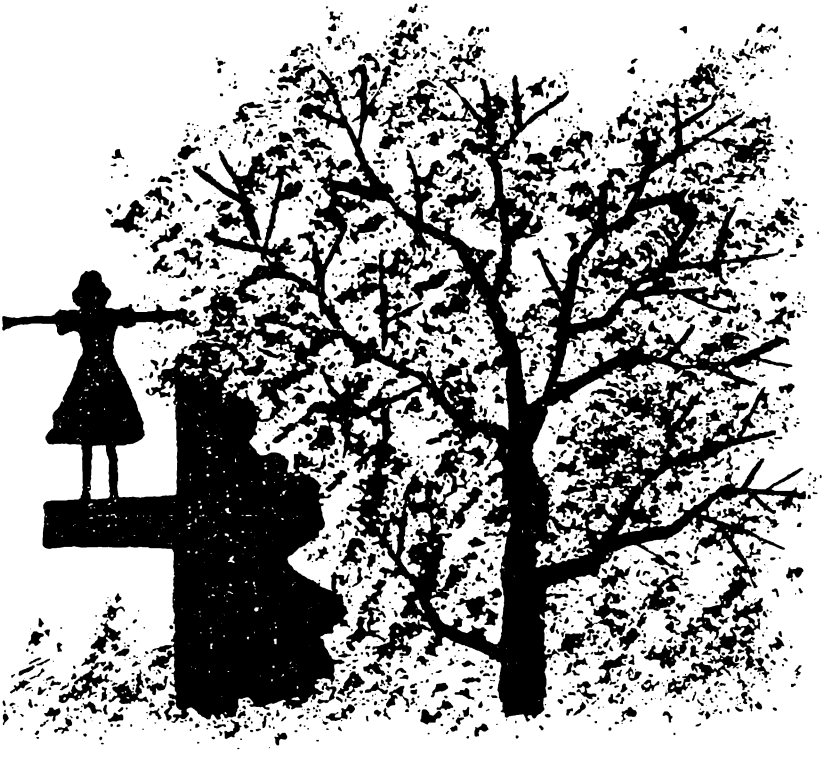

বারো বছরের মিনু ভারী অসুখ থেকে ওঠার পর ডাক্তারবাবুরা পরামর্শ দিলেন কিছুদিনের জন্যে ওর চেঞ্জে যাওয়া দরকার। কিন্তু কোথায় যাবেন সেটাই সমস্যা। ক্রিস্‌মাসের ছুটি পড়ে গেছে, বেশ ঠান্ডাও পড়েছে। এসময় বেশিরভাগ মানুষ চেঞ্জে অথবা বেড়াতে বেরোন, ফলে কোথাও বাড়ি খালি পাওয়া যাচ্ছে না। একটা হলিডে হোম বা ভাড়াবাড়ি না হলে কোথাও বেশিদিন থাকাটাও তো অসম্ভব। মিনতি দেবী আর বিনোদবাবুর এখন একটা বড় কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে কাগজ দেখে দেখে হলিডে হোমগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা। কিন্তু কোনোটাই হচ্ছে না। হয় খালি নেই, নয় পছন্দসই বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না। প্রায় যখন চেঞ্জে যাবার আশা ছেড়ে দিয়েছেন ওঁরা ঠিক তখনই একটা ঘটনা ঘটল। বিনোদবাবুর অফিসের বন্ধু জয়ন্ত ঘোষালের মামাশ্বশুরের বাড়ির একটা সন্ধান পাওয়া গেল। বাড়িটা জসিডি স্টেশনের কাছেই।

মাত্র পাঁচ বছর আগে তারক মুখার্জী অর্থাৎ জয়ন্তবাবুর স্ত্রীর মামা জসিডিতে একটা বাড়ি কিনেছিলেন। ইচ্ছে ছিল মাঝেমধ্যে গিয়ে থাকবেন। তারকবাবু কলকাতার বড় ব্যবসায়ী। সুতরাং, পয়সার কোনো অভাব নেই। আর তার ফলে যা হয়ে থাকে আত্মীয়-স্বজন প্রায়ই জসিডির বাড়িতে গিয়ে ক'দিন করে থেকে আসে।

তারকবাবু তাঁর ভাইপো মন্মথকে খুব ভালবাসতেন। মন্মথ তার স্ত্রী জয়া আর বারো বছরের মেয়ে মাধুরীকে নিয়ে বেড়াতে গেল জসিডির বাড়িতে। কিন্তু সাতদিন যেতে না যেতে সাংঘাতিক একটা খবর এলো। তারকবাবু খবরটা শুনে বজ্রাহত হয়ে গেলেন। ছোট্ট মাধুরী অত্যন্ত দুরন্ত ছিল। সব সময় তাকে চোখে চোখে রাখতে হত। জসিডির বাড়ির ছাদের কার্নিশটা খুব চওড়া ছিল। মাধুরী সবার অলক্ষ্যে ছাদের কার্নিশে উঠে সার্কাস সার্কাস খেলতে গিয়ে দোতলা থেকে একতলায় পড়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ। খবরটা পাওয়ামাত্র পাগলের মতো ছুটে চলে যান তারকবাবু। কিন্তু সেখানে গিয়ে যা দেখেন তাতে তাঁকে সামলানোই দায় হয়ে ওঠে। মেয়ের শোকে মন্মথ আর জয়া দুজনেই বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। তারকবাবুকে অসুস্থ অবস্থায় কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়। একটু সুস্থ হয়ে তারকবাবু উঠে পড়ে লাগলেন বাড়িটি বিক্রি করার জন্যে। কিন্তু বাড়িটা বিক্রি হল না। ওখানকার মানুষের ধারণা বাড়িটায় ভূত আছে। সন্ধের পর নাকি বাড়িতে ওদের ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

জয়ন্তবাবুর কাছে সব শুনে বিনোদবাবু বলেন—শোন জয়ন্ত, বাড়িটা যখন এখনো বিক্রি হয়নি, আমরা ক'দিন নয় ওখানে কাটিয়ে আসি। তারপর বিক্রি কর।

অবাক হয়ে জয়ন্ত বললেন—বাড়িটা ভূতের শুনেও তুমি থাকতে চাইছো?

বিনোদবাবু বললেন—আমরা ভূতে বিশ্বাস করি না। এসব লোকাল লোকদের রটনা।

—কিন্তু.....একটু ইতস্তত করলেন জয়ন্তবাবু।

বিনোদবাবু জয়ন্তকে থামিয়ে দিয়ে বলে—আর কোনো কিন্তু নয় ভাই—তুমি তারকবাবুকে রাজি করাও। আর একটা কথাও বোল তুমি তারকবাবুকে—যদি আমরা প্রমাণ করে দিতে পারি বাড়িটা ভূতের বাড়ি নয় তাহলে কিন্তু বিক্রি হতে আর অসুবিধে হবে না।

কথাটা জয়ন্তবাবুর মনে ধরল। তিনি তারকবাবুকে বলে বিনোদবাবুদের জন্য বাড়িটা ব্যবস্থা করে দিলেন।

বাড়িটা হাতে পাবার পর বিনোদবাবু গেলেন তারকবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। লম্বা-চওড়া ফর্সা চেহারার মানুষটাকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। কিন্তু মুখের মধ্যে একটা বিষাদের ছাপ। পরিচয় দেবার পর বিনোদবাবু বললেন—আপনি আমাকে বাড়িটা দিয়ে খুব উপকার করলেন দাদা। এখন বলুন, এর জন্যে কত ভাড়া দিতে হবে।

তারকবাবু একটু চুপ করে থেকে বললেন—আপনি শুনেছেন হয়তো, লোকে বলে ওখানে অশরীরী আত্মা আছে। তা সত্ত্বেও থাকতে চাইছেন?

অতিথি

—দেখুন, আমার মেয়ের চেঞ্জের জন্যে আমাকে এখন বেশ কিছুদিন স্বাস্থ্যকর জায়গায় থাকতে হবে। কিন্তু কোনো জায়গা পাচ্ছি না।

—আপনি ভূতের বাড়ি শুনেও নেবেন? আপনার স্ত্রী-কন্যা যদি ভয় পায়? অসুস্থ হয়ে পড়ে?

—না না—। ঘন ঘন মাথা নেড়ে বিনোদবাবু বলে ওঠেন—আমি এ সব বিশ্বাস করি না। তাছাড়া এ সব কথা আমি ওদের বলবই না। আপনি আর কিন্তু করবেন না দাদা, শুধু বলুন কত টাকা ভাড়া দেব?

—কতদিন থাকতে চান?

—এই ধরুন একমাস।

—বেশ। তবে বলি শুনুন, যদি আপনি প্রমাণ করে দিতে পারেন ওটা ভূতের বাড়ি নয় তাহলে আপনার কাছে এক পয়সাও নেব না। কারণ এর ফলে ভাল দামেই ও বাড়ি বিক্রি হয়ে যাবে। আর যদি সত্যিই ভূত থাকে তবে তো আপনি ওখানে থাকতেই পারবেন না। যদি থাকেন তো তখন দেখা যাবে।

তারকবাবু উঠে দাঁড়ালেন। ড্রয়ার থেকে এক গোছা চাবি বার করে বিনোদবাবুর হাতে দিয়ে বললেন—এই নিন ও বাড়ির চাবি। দরকার হলে আমাকে ফোনে খবর দেবেন।

বিনোদবাবু নমস্কার করে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তারকবাবু পিছু ডাকলেন—শুনুন—। একটু সাবধানে থাকবেন।

বিনোদবাবু একটু হেসে বেরিয়ে গেলেন।

খুব সুন্দর বাড়িটা, বেশ বাংলো প্যাটার্নের। ওরা গিয়ে দাঁড়াতেই একজন দরজা খুলে দিল। পরিচয় দিল 'মলুয়া' বলে। ঐ বাড়ির দেখাশোনার ভার ওর ওপর রয়েছে। সারাদিন ও থাকে কিন্তু রাত্তিরে একটু দূরে ওর নিজের ঘরে চলে যায়। সেখান থেকে নজর রাখে এ বাড়ির ওপর। ওরা যখন পৌঁছোল তখন প্রায় বিকেল। মলুয়া মিনতির দিকে তাকিয়ে বলল—মা, আমার বৌ দুখিয়া রসুই করে দেবে—আর সব কামভি করবে, তুকে ভাবতে হবে না।

তারপর মিনুর দিকে তাকিয়ে ছলছল চোখে বলল—তুই ঠিক আমার দিদিমণি আছিস। তুকে আমি দিদিয়া বলে ডাকব? কেমন!

মলুয়ার কালো কুচকুচে চেহারাটার মধ্যে এমন সরলতা দেখে ওরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে ঢুকে অবাক হয়ে গেল। এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যে মনে হয় না এখানে এখন কেউ থাকে না। বিনোদবাবু হঠাৎ বলে ওঠেন—মলুয়া চল তো, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে। মলুয়াকে নিয়ে বাগানের ভেতর গিয়ে বিনোদবাবু বললেন—মলুয়া, যা শুনেছি সব সত্যি? এ বাড়িতে ভূত আছে?

মলুয়া মাথা নিচু করে খানিক্ষণ বসে, তারপর মাথা তুলে বলে ওঠে—বাবু, আপনি তো সব শুনে জেনে এসেছেন। একটু সাবধানে থাকবেন, আমি আর কি বলব?

বিনোদবাবু বুঝলেন মলুয়া কিছু বলতে চায় না, তাই আর জোর না করে বললেন—শোন মলুয়া, তুমি আমি যা জেনেছি বা দেখব—মিনতি আর মিনুকে বলব না। তুমিও বলবে না কিন্তু। ঠিক আছে?

মলুয়া মাথা নেড়ে জানায়—সব ঠিক।

সন্ধে ছটার পর মলুয়া আর থাকে না। ঠিক ছ'টা বাজতেই মলুয়া বিনোদবাবুর কাছে ছুটি নিয়ে চলে গেল। বাড়িটা বাংলো প্যাটার্নের। নীচে ঢুকেই যে ঘর সেটা বসার ঘর। এই বসার ঘরের দু'পাশে দুটো বেডরুম। দুটোই চাবি দেওয়া। বিনোদবাবু নীচের ঘর নিয়ে চিন্তা করেননি। তিনি ওপরে অর্থাৎ দোতলায় যে তিনটে বেডরুম আছে সেগুলোই নিয়েছেন। সামনে ছোট্ট একটা ছাদ। ওপরটা ঘেরা। মিনতি দেবী ঠিক করলেন ঐখানেই তিনি রান্না করবেন। বিনোদবাবু দেখলেন খাটের ওপর সুন্দর পরিপাটি করে বিছানা করা। তাতে তিনজনের শোবার মতো বালিশ, গায়ের চাপা পরিপাটি করে বিছানো। মিনতি দেবীরও ব্যাপারটা অবাক লাগছিল। তিনি বিনোদবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—দেখে মনে হচ্ছে, যেন কেউ এখানে থাকে।

—কে আবার থাকবে? বিনোদবাবু তাড়াতাড়ি মিনতি দেবীর সন্দেহ ভঞ্জন করার চেষ্টায় বলে ওঠেন—কি যে বল না? দেখলে তো ঘরবাড়ি সব বন্ধ ছিল, আমরাই তো এসে খুললুম।

চিন্তিত মুখে মিনতি বললেন—সেটা অবশ্য ঠিকই বলেছ তুমি। যাক গে, তুমি হাতমুখ ধুয়ে নীচে বসার ঘরে বোস, আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।

বিনোদবাবু বললেন—শোন, মলুয়া বলে গেছে নীচটা খোলা আছে। আমি বরং বন্ধ-টন্ধ করি। আজ আর কিছু খোলাখুলি কোরো না। তাড়াতাড়ি খেয়ে সব শুয়ে পড়ব। যা করার কাল সকালে করা যাবে।

নতুন জায়গায় এসে মিনুও খুব খুশি। নীচের ঘরে বসে সকলে চা-জলখাবার খাচ্ছে এমন সময় দরজায় মৃদু টোকা। বিনোদবাবু দরজা খুলতে একটু ইতস্তত করছিলেন কিন্তু বাইরে থেকে ভেসে এল এক পুরুষের কণ্ঠস্বর। বললে—ভয় নেই বিনোদবাবু, দরজাটা খুলুন। আমরা তারকবাবুর লোক।

বিনোদবাবু আর দ্বিধা না করে দরজাটা খুলে দিলেন।

সামনে দাঁড়িয়ে এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় পরিবার।

মনে হয় স্বামী-স্ত্রী আর তাদের এগারো-বারো বছরের একটি মেয়ে।

বিনোদবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন—কি ব্যাপার বলুন তো! এত রাতে.....

ভদ্রলোক বললেন—আমার নাম রথীন্দ্রনাথ। ইনি আমার স্ত্রী জয়া দেবী। আর আমাদের একমাত্র কন্যা পাপিয়া। আমরা তারকবাবুর খুব নিকট আত্মীয়। দেওঘরে আমাদের পুজো দিতে আসার কথা ছিল। ভেবেছিলাম ওনার বাড়িটা তো খালিই

থাকে তাই আগে থেকে বলবার দরকার নেই। কিন্তু আজ সকালে তারকবাবু বললেন আপনাদের কথা। আরও বললেন—নীচের ঘর দুটো তো খালি থাকবে। ওরই একটা ঘরে আমরা থাকতে পারি। অবশ্য আপনাদের যদি কোনো অসুবিধে না হয়।

বিনোদবাবু হেসে বললেন—বাড়ি তো আপনাদের। নিশ্চয়ই থাকবেন। অসুবিধে কি বলছেন মশাই, আমার তো শুনে ভালই লাগছে। এই নির্বান্ধব পুরীতে তবু একটা সঙ্গী পাওয়া গেল। আসুন, ভেতরে আসুন।

বাড়ির সব চাবি ছিল বিনোদবাবুর কাছেই তাই কোনো অসুবিধে হল না।

মিনতি দেবী বললেন—আপনাদের রান্না-খাওয়ার কি হবে?

জয়া দেবী হেসে বললে—এ বাড়িতে আমি বহুবার এসেছি। নীচের ঘরে রান্নার সুন্দর জায়গা আছে। আপনারা চিন্তা করবেন না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওরা বেশ মিশে গেল। মিনু তো পাপিয়াকে পেয়ে খুব খুশি। শুতে যাবার আগে মিনু বলে—পাপিয়া কাল সকালে চলে আসবি ওপরে। আমার অনেক বই আছে দেখাব।

জয়া দেবী একটু কিন্তু কিন্তু করে বললেন—একটা ব্যাপার আছে। সেটা হল পাপিয়ার চোখে কনজেনটিভাইটিস হয়ে রেটিনার একটা সমস্যা হয়েছে। ডাক্তার ওকে দিনের বেলা ঘর থেকে একদম বেরোতে বারণ করেছেন। আর সেজন্যে ওকে সঙ্গ দিতে আমাকেও থাকতে হয়। তবে সূর্য ডোবার পর আর কোনো অসুবিধে নেই।

পরদিন সকালে উঠে বিনোদবাবু ভদ্রলোকের অনেক খোঁজ করলেন, পেলেন না। সব-চেয়ে অবাক লাগল, ওদের ঘরটায় বাইরে থেকে চাবি ঝুলছে। সারাদিন ওদের কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। সন্ধে ঠিক সাড়ে ছ'টা নাগাদ ওরা আবার হাজির হল।

বিনোদবাবু কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলেন—কি হল মশাই, সারাদিন থাকেন কোথায়?

—আর বলবেন না। দেওঘর গিয়েছিলাম সব ব্যবস্থা করতে। আটকে গেলাম এক পাণ্ডার পাল্লায় পড়ে। ছাড়ুন ওসব কথা। আপনি দাবা খেলতে পারেন?

বিনোদবাবু খুশি হয়ে বললেন—ওরে বাবা, দাবা আমার সবচেয়ে প্রিয় খেলা।

—আপনি বোর্ড এনেছেন?

—না আনিনি তো, কেন যে আনলাম না! এখন আফশোস হচ্ছে।

—তাতে কি আমারটায় খেলব। দাঁড়ান নিয়ে আসছি।

যতই পাশাপাশি ঘর হোক এত তাড়াতাড়ি কেউ বোর্ড আনতে পারে তা বিনোদবাবুর ধারণারও অতীত। কিন্তু তেমন করে আর ভাবতে সময় পেলেন না বিনোদবাবু। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরোপুরি জমে উঠল ওঁদের আড্ডা।

মিনতি দেবী জয়া দেবীকে নিয়ে ওপরে চলে গেলেন। আর মিনু পাপিয়াকে ছবির বই দেখাতে লাগল।

সন্ধে পেরিয়ে রাত হল, ওদের ওঠার কোনো লক্ষণ নেই। মিনতি দেবী শেষে বলেই ফেলেন—আপনারাও তো খাবেন—রাত হল।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে জয়া দেবী একটু হেসে বললেন—বেশ লাগল আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে, চলি।

দু' একদিন পরে হঠাৎ মিনু একদিন মিনতি দেবীকে ডেকে বলল—জানো মা? পাপিয়া কেমন ম্যাজিক জানে। তুমি যা চাইবে ও ঘরে বসে তোমায় এনে দেবে। উঠতেও হবে না।

শুনে অবাক হলেন মিনতি দেবী। বললেন—সে আবার কিরে, তাও আবার হয় নাকি!

—বেশ আমি তোমায় দেখাব। তাহলে বিশ্বাস হবে তো? শুধু ম্যাজিক না মা, ও ভাল সার্কাসও জানে। বলে আমি দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতেও পারি।

—সে কিরে! পড়ে যাবে তো? আঁতকে ওঠেন মিনতি দেবী।

পরদিন সকাল এগারোটা নাগাদ হঠাৎ চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনে ছুটে আসেন বিনোদবাবু, মিনতি দেবী। বাইরে এসে যা দেখলেন তাতে অতিকষ্টে নিজেকে সামলালেন। দেখালেন পাপিয়া রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। আর তার পাশে দুটো মৃতদেহ। একটা জয়া দেবীর, অন্যটা রথীন্দ্রনাথের। মলুয়া কাছেই ছিল। বিনোদবাবু চিৎকার করে ওঠেন। —মলুয়া, তারকবাবুকে এখুনি খবর পাঠানো দরকার। এ সব কি করে হল!

মলুয়া খুব ঠান্ডা গলায় বলে ওঠে—আপনি এসব নিয়ে ভাববেন না বাবু।

বিনোদবাবু প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলেন—কি বলছো মলুয়া! আমি ভাববো না! এমন একটা ঘটনা! এক্ষুনি ডাক্তার, অ্যামবুলেন্স চাই।

মলুয়া তেমনি ঠান্ডা গলায় বলে—কোনো লাভ নেই বাবু, ওরা কেউ বেঁচে নেই।

বিনোদবাবু শুনলেন না ওর কথা। জামাটা কোনোরকমে গলিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

মিনতি দেবী মিনুকে নিয়ে ঘরে খিল দিলেন। কি জানি মিনু অসুস্থ। যদি কোনো ভাবে দেখে ওর বন্ধুকে ঐ অবস্থায়—কি না হতে পারে।

মলুয়া শেষবারের মতো বাধা দেয় বিনোদবাবুকে। বলে—বাবু, যাবেন না। শুনেন না হামার কথা।

আধঘন্টার মধ্যে ডাক্তার, অ্যামবুলেন্স সব নিয়ে এসে হাজির করলেন বিনোদবাবু।

কিন্তু একি, তিন তিনটে ডেডবডি গেল কোথায়!

বিনোদবাবু চিৎকার করে ওঠেন—মলুয়া, ওদের কোথায় সরালে?

মলুয়া ক্লান্ত হেসে বলে—বাবু, আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে! এখানে তো কিছু হয়নি। আপনি এসব কি বলছেন?

হতভম্ব বিনোদবাবু ধপ্ করে বসে পড়লেন বাইরে ঘাসের ওপর। ডাক্তারবাবু রাগ করে বললেন—পাগল জানলে কি বিশ্বাস করতুম ওঁর কথায়! ছিঃ ছিঃ সময় নষ্ট হল—ঝামেলার একশেষ।

সমস্ত ঘটনায় পরিস্থিতি থমথমে হয়ে গেছে। বসার ঘরে চুপ করে বসে আছেন বিনোদবাবু। মলুয়া ঘরে ঢুকল। বিনোদবাবুর পায়ের কাছে এসে বলল—বাবু—আপনাকে বলেছিলুম না—

বিনোদবাবু মলুয়ার দিকে চোখ তুলে তাকালেন।

মলুয়া বলল—আজ অঘ্রান মাসের পাঁচ তারিখ—ঠিক এমনি দিনে এমনি সময়ে গতবছর রথীন্দ্রনাথবাবু, বৌদিমণি আর পাপিয়া দিদিমণি—তিনজনেই মারা গেছিল।

বিনোদবাবু চমকে উঠে বললেন—মানে?

—বাবু, এরাই তারকবাবুর ভাইপো ও তার পরিবার। এ বাড়ির মায়া এরা ছাড়তে পারেনি। এখানেই থাকে।

বিনোদবাবু বললেন—তবে যে সেদিন রাত্তিরে ওরা এসে বললেন—তারকবাবু পাঠিয়েছেন।

—মিথ্যে কথা না বললে আপনারা তো সন্দেহ করবেন। তাই বলেছে। একটা কথা বলি বাবু, আপনারা কিন্তু আর এখানে থাকবেন না। প্রেতাত্মাদের ব্যাপার। কখন কি করে ঠিক আছে!

সেদিন সন্ধেবেলাই বিনোদবাবু যাত্রা করলেন কলকাতার দিকে।

আলেয়া

বনগাঁ অঞ্চলের এক ছোট্ট গ্রাম। পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ইছামতী নদী। তারই ধার ঘেঁষে ছোট্ট একটা দোতলা বাড়ি। বাড়ির চারদিক বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা। বাড়ির পাশে একটা ছোট্ট কুটীর। কুটীরের পাশে একটা গভীর জলের টিউবওয়েল। বাড়ির সামনে ছায়াঘেরা বাঁধানো উঠোনে একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন মণীশ দত্ত। রিটায়ার্ড অফিসার। ভেবেছিলেন বহুদিন কলকাতায় কাজ করে তো কাটিয়ে দিলেন, বাইরে কোথাও একটা বাড়ি কিনে শেষ জীবনটা আরামে কাটিয়ে দেবেন। একটামাত্র মেয়ে, এখনও বিয়ে হয়নি। হোস্টেলে থেকে এম. এ পড়ছে। পাশ করলে বিয়ে করবে না, কেরিয়ার তৈরি করবে। মণীশবাবুর আপত্তি থাকলেও মেয়ের ইচ্ছেতে বাধা দেননি। ভাবলেন, ও ওর মতো থাক আমি আমার মতো। এই সময় খবরের কাগজে দেখলেন খুব সস্তায় বনগাঁ অঞ্চলের এই বাড়িটা বিক্রি আছে। বাড়ির মালিক মৈনাক মুখোপাধ্যায় কলকাতারই বাসিন্দা। মণীশবাবু মৈনাকবাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। এর দিন কুড়ি-পঁচিশ বাদেই মণীশবাবু এ বাড়িটার মালিক হয়ে গেলেন। কিন্তু কিছু রিপেয়ারের দরকার ছিল। মণীশবাবু সেই কাজটা শুরু করে দিলেন। মৈনাকবাবুর কাছেই তিনি শুনেছিলেন তাঁর দুজন কেয়ারটেকার বাড়িটার দেখাশোনা করে। ওরা ঐ বাড়িরই পাশের কুটীরে থাকে। মণীশবাবু তাদের সঙ্গে দেখা করলেন। রাম আর লক্ষ্মণ দুই ভাই। মৈনাকবাবু

এই দুটি অনাথ ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ঐ কুটীরে। সেই থেকে তারা এখানেই রয়ে গেছে। মণীশবাবু বাড়ি সারানোর দায়িত্ব ও দেখাশোনা করার জন্যে এই দুই ভাই রাম-লক্ষ্মণকে পুনরায় বহাল করলেন। তারপর বাড়ি সারানো শেষ হতে স্ত্রী মলিনাকে নিয়ে তিনি এখানে এসে পৌঁছলেন। পরের দিন ঋতা মানে ওঁদের একমাত্র মেয়েও এসে হাজির হল। বলল—ক'দিনের জন্যে ছুটি নিয়ে এলাম বাবা।

—বাঃ বেশ করেছিস মা। ক'দিন তোকে পেয়ে আমাদের যে কত ভাল লাগবে কি বলব।

রান্নাঘরে মলিনাদেবী আর ঋতা গল্প করছে। মণীশবাবু বাইরে বসে ওদের হাসির শব্দ শুনছেন চোখ বুজে, আর বাইরের এই শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশটকে উপলব্ধি করছেন।

হঠাৎ সোঁ সোঁ শব্দ। ঝড় উঠল নাকি? কালবৈশাখির ঝড়? হতেই পারে। সময়টা তো চৈত্রের শেষ। সোজা হয়ে বসেন মণীশবাবু। বড় বড় তাল, অশ্বত্থ গাছগুলো ভীষণভাবে দুলছে। আম গাছের মাথার ওপরটাও ভয়ঙ্কর নড়ছে। যেন ক্ষেপে গেছে। ছোট ছোট আমে ভর্তি হয়ে গেছল গাছটা। কত আম যে পড়বে তা ঠিক নেই। কুটীরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো রাম-লক্ষ্মণ। মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেছে। মণীশবাবুর কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। মণীশবাবুর মুখেও বিস্ময়! ঝড় উঠল। তাঁদের গায়ে হাওয়া লাগবে, চারদিকে ধুলোয় ভরে যাবে—কিন্তু আশ্চর্য একফোঁটা হাওয়া তাঁর গায়েও লাগছে না। সন্ধের অন্ধকার নেমেছে। আকাশে মেঘ নেই, দূরে কোথাও এতটুকু কালো মেঘও জমেনি। তাহলে? তাকালেন রাম-লক্ষ্মণের দিকে। কিন্তু একি! রাম-লক্ষ্মণের মুখটা সাদা কেন! ওরা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে বাড়ির সামনে দাঁড়ানো মোটা গাছের গুঁড়ির গায়ে ঝোলান হ্যারিকেনটার দিকে। মণীশবাবু কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন—কিন্তু পারলেন না। পরিষ্কার দেখলেন লণ্ঠনের আলোটা বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল। দু'বার দুলে উঠল। মণীশবাবুর মনে হল আলোটা তাঁকে ডাকছে, তাঁকে আকর্ষণ করছে। উনি উঠে দাঁড়াতেই আলোটা এগিয়ে চলল বাড়ির এলাকা ছাড়িয়ে সামনের বিশাল অন্ধকার মাঠের দিকে। মণীশবাবু সম্মোহিত হয়ে এগিয়ে গেলেন। চিৎকার করে উঠল রাম-লক্ষ্মণ।—বাবু যাবেন না—যাবেন না—ফিরে আসুন। থমকে দাঁড়ালেন মণীশবাবু। আলোটাও দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু মণীশবাবু পেছন ফিরে তাকালেন না।

একদৃষ্টে আলোর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে চললেন। আলোটাও চলতে শুরু করল। রাম-লক্ষ্মণ বহুদিন এখানে আছে। ওরা জানে—আলেয়ার আলো যাকে টানে তাকে শেষ করে দেয়—আর যারা ধরতে যায় তারাও শেষ হয়ে যায়। মণীশবাবুর পেছন পেছন ওরা বাবু বাবু বলে ডেকে চলল কিন্তু আটকাতে ভয় পেল। ওদের জীবনেও ওরা একবার দেখেছিল একজনকে আলেয়ায় টেনে নিয়ে যেতে। আর শুনেছে তাদের গ্রামের বুড়ো চক্রবর্তীকেও নাকি আলেয়া ধরেছিল। ওদের চিৎকার শুনে দৌড়ে এলেন মলিনা দেবী আর ঋতা। একটু দূরে দূরে ঘর হলেও নিস্তব্ধ জায়গায় রাম-লক্ষ্মণের

চিৎকার অনেকের কানে গিয়েছিল। বেশ কয়েকজন জড়োও হয়েছে। একজন বৃদ্ধা চিৎকার করে উঠলেন—ওরে কেউ তোরা ওঁকে বাঁচা রে—ঠাকুরের নাম কর।

একথা শুনে ভয়ে চিৎকার করে ছুটে গেলেন মলিনা দেবী। কয়েকজন যুবতী বৌ-ঝি ওঁকে চেপে ধরল—মাসিমা যাবেন না।—গেলে আপনিও মরবেন। ঋতা আজকালকার মেয়ে। অত্যন্ত সাহসী। তাছাড়া কোনো কুসংস্কার মানার প্রশ্নই ওঠে না। তার বাবার বিপদ এটাই বড় কথা। সবার চোখ এড়িয়ে ও ছুটে গেল মণীশবাবুর দিকে। মণীশবাবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো ফাঁকা মাঠের ধারে ঝোপঝাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছেন। বৃদ্ধা আবার চিৎকার করে উঠলেন, ঝোপের মধ্যে ঢুকলেই ওঁকে মেরে ফেলবে আলেয়া। ঋতা শুনল সে কথা। তাই প্রাণপণে ছুটে সে পৌঁছে গেল তার বাবার কাছে। মণীশবাবু ঠিক সেই মুহূর্তে পা বাড়িয়েছেন ঝোপের দিকে। ঋতা বাবা বাবা বলে চিৎকার করে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার ওপর। রাম-লক্ষ্মণ ঋতাকে আটকাতে ছুটে এসেছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে দেখল ঋতা মণীশবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই কে যেন ছুঁড়ে দিল ঋতাকে দূরে। ঋতা অজ্ঞান হয়ে গেল। আর মণীশবাবু ঠিক ঝোপের মুখটায় এসে হঠাৎ থমকে গেলেন। সম্বিত ফিরে পেলেন। ভাবলেন, এখানে আমি কি করছি! তারপরই পেছন ফিরে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন। এত লোক কেন? একি! ঋতা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। রাম-লক্ষ্মণ তার চোখেমুখে জল দিচ্ছে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ঋতার জ্ঞান ফিরল। প্রায় ভ্যাবাচাকার মতো তাকিয়ে বলল—কি হয়েছে আমার? তোমরা সব আমায় ঘিরে আছ কেন?

রাম-লক্ষ্মণ বলল—তুমি মা আজ তোমার বাবার প্রাণ রক্ষা করেছ।

ঋতার যেন কি মনে পড়ল, বলল—হ্যাঁ আমি তো বাবাকে চেপে ধরতে গেছি—কিন্তু প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক লাগার মতো লাগল। কে যেন আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সকলে বলাবলি করতে লাগল—এর আগে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি। আজ মেয়ের জন্য বাপের প্রাণ বাঁচল।

মলিনা দেবী কিন্তু হঠাৎ কেমন চুপ করে গেলেন। তাঁর মনে পড়ল সন্ন্যাসীর কথা। সে কথা তিনি আজ অব্দি কাউকে বলেননি। প্রতি শনিবার তিনি ভগবতী দেবীর মন্দিরে পুজো দিতে যান। গত শনিবারও গিয়েছিলেন—পুজো দিয়ে বেরিয়ে দেখলেন এক জটাজূটধারী সাধু তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

মলিনা দেবী কাছে আসতেই ডাকলেন সাধু—মা—একবার এদিকে আসুন তো।

মলিনা দেবী সাধুর কোমল স্বরে মুগ্ধ হয়ে বললেন—আপনি আমায় ডাকছেন বাবা?

সাধু বললেন—মাগো, সামনে আপনার একটা বিপদ দেখতে পাচ্ছি। আপনি এই মৃত্যুঞ্জয় ফুলটা বাড়ি নিয়ে যান। এটিকে ভাল করে সুতো দিয়ে বেঁধে স্বামীর হাতে বা গলায় পরিয়ে দেবেন। সব বিপদ কেটে যাবে।

নাস্তিক মানুষ মণীশবাবু। সে কথা জানতেন মলিনা দেবী। বললেন—বাবা, আমার

স্বামী এ সবে বিশ্বাস করেন না। উনি পরবেন না। আমি পরলে কাজ হবে?

সন্ন্যাসী একটু চোখ বন্ধ করে কি যেন চিন্তা করেন, তারপর বলেন—মা, আপনার ছেলেমেয়ে আছে?

মলিনা দেবী বললেন—আমার একটা মেয়ে। কলকাতায় থাকে। এখন আমার কাছে এসে রয়েছে।

সন্ন্যাসী বললেন—তবে শুনুন মা, সন্তান হল পিতামাতার আত্মা। আপনি ওকে পরিয়ে দিন।

—কিন্তু ও তো আবার কলকাতায় ফিরে যাবে।

—কবে? প্রশ্ন করেন সন্ন্যাসী।

একটু ভেবে বলেন মলিনা দেবী—দিন পনেরো পরে।

সন্ন্যাসী মাথা নেড়ে বললেন—ঠিক আছে, এখন তো থাক পরে দেখা যাবে।

মলিনা দেবী বাড়িতে এসে ঋতাকে বলতে ঋতা খুব রেগে গেল। বলল, মা, আমি এসব একদম বিশ্বাস করি না, আমি এসব পরব না।

মলিনা দেবী খুব চিন্তিত মুখে বললেন—শোন ঋতা—সন্ন্যাসীকে জিগ্যেস করেছিলাম, আপনাকে কত টাকা প্রণামী দেব এর জন্যে? সন্ন্যাসী বলেছিলেন—এক পয়সাও না। আপনি শুধু বিশ্বাস রাখুন। বলতে পারিস এ ফুল দেওয়ার পেছনে সন্ন্যাসীর কি স্বার্থ আছে! তোর বাবার জন্যে ক'টা দিন তুই এটা গলায় পরে থাকতে পারবি না?

এরপর ঋতা আর আপত্তি করেনি, মলিনা দেবী জানেন—আজ তাঁর স্বামীর প্রাণ বাঁচার পেছনে ঐ সন্ন্যাসীর অবদান সবচেয়ে বেশি। ঋতার গলায় যদি মৃত্যুঞ্জয় কবচ না থাকতো তাহলে আজ স্বামী-মেয়ে দুজনকেই হারাতে হত। মলিনা দেবী ঠিক করলেন আগামী কাল তিনি ওদের নামে পুজো দিতে ভগবতী মন্দিরে যাবেন আর সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করবেন।

মলিনা দেবীকে চুপচাপ থাকতে দেখে অবাক হলেন মণীশবাবু। বললেন—কিগো—তুমি অবাক হওনি?

—কিজন্যে বল তো! মলিনা দেবী না বোঝার ভান করলেন।

মণীশবাবু একটু দুঃখ করে বললেন—এই যে, তোমার মেয়ের জন্যে আমার প্রাণ বাঁচল। ঋতার মধ্যে এত শক্তি আছে?

ম্লান হাসলেন মলিনা দেবী। বললেন—আমি আর কি বলব বল। তুমি তো নিজেই বুঝতে পারছ।

স্বামীর কাছে সন্ন্যাসীর গল্প বলে লাভ নেই। মলিনা দেবী জানেন মণীশবাবু বিশ্বাস তো করবেনই না বরং রাগারাগি করবেন ঋতাকে গলায় মৃত্যুঞ্জয় ফুল পরানো হয়েছে বলে। ঋতাও বাবাকে জানে। তাই মাকে বাঁচাতে সেও কোনো কথা বলল না।

মণীশবাবুর কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না পুরো ব্যাপারটা। এর মধ্যে ভূতুড়ে

কোনো ব্যাপার বা অলৌকিক কোনো ব্যাপার আছে বলে তাঁর মনে হচ্ছে না। পুরোপুরি ব্যাপারটা বিজ্ঞানভিত্তিক বলে তাঁর ধারণা। ঝোপঝাড়ের মধ্যে পচা জিনিস থেকে ফসফরাস তৈরি হয়ে হয় মার্স গ্যাস। এই গ্যাস থেকেই আগুন জ্বলে ওঠে ধক্‌ধক্ করে। লোকে না বুঝে সেটাকে আলেয়া বলে। এখানেও নিশ্চয়ই ঐ ঝোপের মধ্যে পচা কিছু থেকে ফসফরাস হয়ে গ্যাস তৈরি হয়েছে। কিন্তু সব ব্যাপারটাই দুয়ে দুয়ে চার হচ্ছে না মণীশবাবুর কাছে। আর একবার ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন মণীশবাবু। জলা জায়গা আর বহুদিনের ফেলা পচা দুর্গন্ধযুক্ত আবর্জনা থেকে এরকম গ্যাস জ্বলে এটা ঠিক। তবে কি তিনি ঐ ধরনের কিছু দেখে ছুটে গিয়েছিলেন?

তাঁর আশ্চর্য লাগছে ঝড়ের ব্যাপারটা। অত হাওয়া, গাছের মাথা দুলছে অথচ নীচে একফোঁটা হাওয়া নেই। দ্বিতীয়ত, উনি নিজের চোখে দেখলেন লণ্ঠনের আলোটা বেরিয়ে এলো তাঁর সামনে। তৃতীয়ত, তাঁর নিজের কী হয়েছিল? তিনি যে আলোর পেছনে ছুটছিলেন সেটা কিন্তু একবারও বুঝতে পারেননি। হাওয়ার ব্যাপারটা নয়, অনেক সময় হাওয়ার গতিবেগটা দ্রুত হওয়ায় গাছের মাথাগুলো বেশি দোলে আর নীচে হাওয়াটা সব কিছুতে বাধা পায় বলে হয়তো ছুটতে পারে না। আর আলোটা লণ্ঠন থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারটা.....না এসবের কোনো ব্যাখ্যা তাঁর কাছে নেই। তবে লোকে যে বলে আলেয়ার পেছনে দৌড়ে মানুষ মরে যায়। এটা নয় মানা যেতে পারে। পচাগন্ধ থেকে গ্যাসের তীব্রতা অনেক সময় মানুষের প্রাণহানিও ঘটাতে পারে! কিন্তু তাঁর নিজের তো কোনোদিন ঘুমের মধ্যে হাঁটার রোগ নেই যে ভাববেন ঘুমঘুম ভাব ছিল—তাই কিছু একটা কল্পনা করে দিব্যি হাঁটতে শুরু করে দিয়েছিলেন। আর ঋতার বাঁচানোটা! যতই তিনি বলুন না কেন বেশ ভাল রকমই জানেন এটা একটা কো-ইন্‌সিডেন্স। যারা ঘুমের মধ্যে হাঁটে তাদের ধাক্কা দিয়েই জাগাতে হয়। ঋতা তাই করেছে। আর তাতেই তাঁর ঘোর কেটে গেছে। রাম-লক্ষ্মণকে ডেকে একটা কথা জিগ্যেস করলেন মণীশবাবু—হ্যাঁ হে, ঐ ঝোপের মধ্যে কি গরুছাগল মরে গেলে ফেলা হয়?

—গরুছাগল কি বলছেন বাবু! মানুষ। মানুষ বলুন বাবু। এখন তো খুনখারাপি লেগেই আছে, সব ফেলা হয় ঐ ঝোপে। ঐ জন্যে তো ওটাকে গ্রামের লোকেরা বলে মৃত্যুপুরী। তেনারা তো ওখানেই থাকেন—ওখান থেকে আসেন আবার ওখানেই ফিরে যান।

—বোগাস্। আমি এসব বিশ্বাস করি না।

সেদিনও সন্ধে হয়ে এসেছে। সামনে ফাঁকা মাঠ আর একটু দূরে বয়ে যাওয়া ইছামতীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নানাকথা ভাবছিলেন মণীশবাবু তাঁর প্রিয় ইজিচেয়ারে বসে। রাম-লক্ষ্মণ দূর থেকে দেখে এগিয়ে আসে।

বাবু—ভর সন্ধেবেলা আপনি এমন করে বাইরে বসে আছেন কেন? ঘরে যান বাবু।

—কেন? কি হবে বসে থাকলে? ভূতে ধরবে!

—রামরাম! এ সব নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা ঠিক নয় বাবু—তেনারা শুনলে.....

এক ধমক দিলেন মণীশবাবু—চুপ-চুপ—একদম চুপ বলছি। আমি তোমাদের আর একটা কথাও শুনতে চাই না। যাও তোমরা ঘরে যাও। যত সব গেঁয়ো ভূত জুটেছে।

ওরা চলে গেলেও বসে থাকেন মণীশবাবু। ঘরের মধ্যে মলিনা আর ঋতা গল্প করছে। মণীশবাবু ভাবলেন কত আর একা বসে থাকা যায়—যাই না হয় ঘরে গিয়ে ওদের সঙ্গে একটু গল্প করি। মণীশবাবু উঠে দাঁড়ান। ঠিক তক্ষুনি এক মহিলা এসে দাঁড়ালেন তাঁর সামনে। মাথায় ঘোমটা। অন্ধকারে মুখটা ভাল দেখা যাচ্ছে না। তবে দেখে ঠিক গ্রাম্য বলে মনে হল না। মণীশবাবু অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন—কি চাই মা? কিছু বলবে? এত রাতে কোনো বিপদ হল নাকি!

মহিলাটি কিন্তু উত্তর দেয় না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

খুব অস্বস্তি লাগে মণীশবাবুর। উনি ভাবলেন মহিলা যখন, নিশ্চয়ই মেয়েদের কাছে কিছু বলবে—পুরুষকে বলতে লজ্জা পাচ্ছে। উনি বাড়ির দিকে মুখ ঘুরিয়ে ডাকলেন—মলিনা, ঋতা একবার বাইরে এস তো।

মলিনা-ঋতা দুজনেই বাইরে বেরিয়ে এল। রাম-লক্ষ্মণও এল। মণীশবাবু বললেন—দেখ তো ইনি কি বলছেন।

—কে! অবাক হয়ে জিগ্যেস করল ঋতা।

—বাবা, তুমি কার কথা বলছো?

—কেন—এই তো.....। মণীশবাবু অবাক হয়ে দেখলেন কেউ কোথাও নেই। বললেন—এই তো এইমাত্র ছিল, গেল কোথায়?

রাম-লক্ষ্মণের মুখ শুকিয়ে গেছে। বলল—বাবু ভেতরে চলুন। বারবার বলছি।

আবার ধমক দেন মণীশবাবু—আবার আরম্ভ করছিস!

রাম বলল—বাবু শুধু শুধু বলছি না। কারণ আছে।

হাসলেন মণীশবাবু—ওঃ আবার কারণও খুঁজে বার করেছো। তা কি কারণ শুনি?

—এখন না বাবু, কাল সকালে বলব। লক্ষ্মণ বলল।

—এখন বললে কি হবে?

—না বাবু, রাতে বলা যায় না এ সব কথা। তেনারা পছন্দ করেন না।

—এই চুপ। নাকি সুরে তেনারা তেনরা করবে না বলছি।

—ঠিক আছে বলব না। তবে বাবু, আপনাকে যা বলার আমরা কাল সকালে বলব।

নাঃ কিছুতেই ওদের মুখ দিয়ে একটা কথাও বার করা গেল না সে রাতে। মণীশবাবু একটু অবাক হলেন—মহিলাটি এলই বা কেন আবার চলেই বা গেল কেন?

পরদিন সকালে জলখাবার খেয়ে, খবরের কাগজটা একটু উল্টোচ্ছিলেন মণীশবাবু। রাম-লক্ষ্মণ এসে হাজির হল। বলল—বাবু আপনার সব কথা জানা দরকার, নয় তো কোনদিন বড় বিপদে পড়বেন।

ভ্রু কুঁচকে তাকালেন মণীশবাবু। বললেন—কি রকম! বিপদে পড়ব মানে? হাতের কাগজটা পাট করে সরিয়ে রেখে প্রশ্ন করলেন মণীশবাবু। রাম-লক্ষ্মণ মণীশবাবুর কাছেই বসল। তারপর বলতে শুরু করল। রাম বলল—বাবু, এই বাড়িটার অনেক ব্যাপার আছে। সবটা না শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন না। আপনি কেনার আগে আর এক বাবু এই বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন।

মণীশবাবু একটু অবাক হলেন। বললেন—কিন্তু আমি তো কেনার আগে করপোরেশনে সার্চ করেছিলাম। এমন কোনো খবর তো পাইনি।

লক্ষ্মণ বলল—কি করে পাবেন বাবু! ওঁরা তো মাত্র সাতদিন ছিলেন।

—সেকি, সাতদিনের জন্যে এসেছিলেন?

—আগে সবটা শুনুন বাবু, তাহলে সব বুঝতে পারবেন। এ বাড়ির আসল মালিক ছিলেন রামসদয় মুখার্জী। তাঁর সংসারে কেউ ছিল না। হরি বলে এক উড়িয়া চাকর তাঁর দেখাশোনা করত। মারা যাবার সময় তিনি নাকি উইল করে বাড়িটা হরির নামে করে দিয়ে যান। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ক'দিন পরে হরিকে কে বা কারা যেন হত্যা করে রেখে যায়। প্রথমটা সকলে মনে করেছিল চোরডাকাতের ব্যাপার। পরে জানা গেল—হরির জাতভায়েরাই তাকে গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস টেনে মারে।

—সেকি? কেন? এর কারণ কি? মণীশবাবু একটু উত্তেজিত হয়েই জিগ্যেস করেন।

রাম-লক্ষ্মণ পালা করে বলে চলল—শোনা গেল হরির জাতভায়েরা হরির কাছে ঘনঘন আসছিল এ বাড়িটাতে ভাগ বসাবে বলে। হরি রাজি হয়নি। ওর ইচ্ছে ছিল বিয়ে-থা করে সংসারী হয়ে বাড়িটা ভোগ করবে। তাছাড়া বুড়োর টাকাপয়সাও কিছু কম ছিল না। সেগুলোর ওপরও হরির খুব লোভ ছিল। কিন্তু যারা হরিকে মারল তারা কিন্তু পয়সাকড়ি কিছু খুঁজে পেল না। কারণ টাকা কোথায় লুকিয়ে রাখতেন রামসদয়বাবু তা একমাত্র হরিই জানত। হরির মৃত্যুর পর থেকে কেউ আর এ বাড়িতে থাকতে পারতো না। ওর জাতভায়েরা চেষ্টা করেছিল কিন্তু বাড়ি দখল নিতে পারেনি। যে যতবার এসেছে সবকটা মরেছে আলেয়ার কবলে পড়ে।

—আলেয়া—? আবার প্রশ্নটা না করে পারলেন না মণীশবাবু।

—হ্যাঁ বাবু, যে আলেয়া আপনাকেও টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। যারাই এসেছে তাদেরই হরি মেরে ফেলেছে আলেয়া হয়ে। এ বাড়ির ওপর দখলটা ও ছাড়তে চায়নি বহুদিন। বাড়িটা ভূতুড়ে বাড়ি বলে পড়েছিল বছরের পর বছর।

এর পর হঠাৎ একদিন দেখা গেল বাড়িটা ভাঙাভাঙি শুরু হয়েছে। মিস্ত্রি কাজ করছে। মৈনাক মুখার্জী এসে বললেন তিনি নাকি রামসদয়বাবুর ভাইপো। সুতরাং এ

বাড়ি আইনত তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে হরির দল এসে হাজির। খুব গোলমাল করল ওরা। বলল—এটা হরির বাড়ি। মৈনাকবাবু শক্ত লোক, বললেন—কোর্টে এর প্রমাণ হবে।

নাঃ, হরির দল কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারল না। বাড়িটা মৈনাকবাবুর প্রমাণ হল। তারপর শান্তি-স্বস্ত্যয়ন চলল পনেরো দিন ধরে। তারপর মৈনাকবাবু আমাদের দুজনকে কেয়ারটেকার রেখে কলকাতায় চলে গেলেন। কোনো গণ্ডগোল নেই। বেশ চলছিল। এই সময় ভুজঙ্গ দত্ত বলে এক ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রী জয়ন্তীকে নিয়ে বেড়াতে এলেন। মাত্র এক বছর হল ওঁদের বিয়ে হয়েছিল। জয়ন্তীদিদি খুব সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু মুশকিল হল উনি সবসময় গা-ভর্তি গয়না পরে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন আমরা গিয়ে ওঁদের দুজনকেই বললাম—এ গ্রামে মাঝেমধ্যে কিন্তু ডাকাতি হয়। জয়ন্তীদিদি আপনি যদি এত গয়না পরে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার সব যাবে। তারচেয়ে আপনি গয়নাগুলো খুলে সরিয়ে রাখুন দিদি।

কথাটা শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন জয়ন্তীদিদি। চোখ বড় করে দু'হাত দিয়ে নিজের গয়নাগুলোকে চেপে ধরে চিৎকার করে বলে ওঠেন—না না—এসব আবার কি কথা! আমার গয়না নিলে আমিও বাঁচব না। এগুলো আমার প্রাণ। আমি কিছুতেই এগুলো খুলবো না। দেখি কে আমার গা থেকে গয়না খোলে।

আমরা আর কি বলব, যা বলার বলেছি। এর বেশি তো আমাদের আর কিছু করার ছিল না। সেদিন রাতে হঠাৎ ভুজঙ্গবাবু দেখলেন ঝোপের মধ্যে আগুন জ্বলছে নিভছে। উনি ভাবলেন বুঝি ডাকাত আসছে। জয়ন্তী ঘুমোচ্ছিল। মাথার কাছে বাক্সের মধ্যে সব গয়না খুলে রেখে শুয়েছিল। ভুজঙ্গবাবু ডাকাতের ভয়ে পুরো বাক্সটা নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের কয়লার গাদার মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন। সকালে জয়ন্তীদি ঘুম থেকে উঠে গয়না না দেখতে পেয়ে ভাবলেন ডাকাতে তাঁর সব গয়না নিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথাটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। এতে ওঁর একটা শক-এর মতো হল। ভুজঙ্গবাবু যত বলেন, চিন্তা কোরো না, সব গয়না আমার কাছে আছে—জয়ন্তীদি কোনো কথাই কানে তোলেন না। শুধু 'আমার গয়না' 'আমার গয়না' বলে ছুটে বেড়াতে লাগলেন সারা বাড়ি। তারপর সন্ধেবেলা একটা শব্দ শুনে ছুটে এসে দেখি জয়ন্তীদিদি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন। সেই থেকে প্রায়ই দেখা যায় একটা বৌকে। হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয়, কারো কোনো ক্ষতি করে না। আমাদের ধারণা এই জয়ন্তীদিদি গয়নার খোঁজ করে চলেছেন এখনও।

মণীশবাবু বললেন—আর ভুজঙ্গবাবু, তাঁর কি হল?

রাম-লক্ষ্মণ বলল—আমরা শুনেছি উনি কলকাতাতেই আছেন।

মণীশবাবু বললেন, যদিও আমি এসব বিশ্বাস করি না তবু চিন্তা হচ্ছে আমার মেয়ে-বৌয়ের জন্যে। ওরা কিন্তু এসব শুনলে বিশ্বাস তো করবেই, এখানে থাকতেও চাইবে না। দেখা যাক কি হয়।

ঋতার এবার ফিরে যাবার কথা হোস্টেলে। মণীশবাবু আর মলিনা দেবীর মন

খারাপ। ঋতারও মন খারাপ, কিন্তু হঠাৎ সন্ধেবেলা থেকে ঋতা কিরকম অদ্ভুত একটা আচরণ করতে লাগল। মুখের চেহারাটাও অন্যরকম, বাড়ির চারদিকে কি যেন খুঁজছে। কারো সঙ্গে কথা বলছে না। মণীশবাবু ঋতাকে চেপে ধরলেন। বললেন—ঋতা মা, কি হয়েছে আমাকে বল। ঋতা মণীশবাবুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে হঠাৎ বলে ওঠে—'আমার গয়না!' তারপরেই মণীশবাবুর হাত ছাড়িয়ে ছুটে যায়। মণীশবাবুর মুখটা কালো হয়ে গেল। এ তো ঋতার কণ্ঠস্বর নয়—এ কার গলা! তা ছাড়া ঋতার গায়ে এ কি অমানুষিক শক্তি! তবে কি সব সত্যি! ঋতার মধ্যে জয়ন্তীর ভূত ঢুকেছে। সারা রাত ওঁরা জেগে বসে পাহারা দিলেন ঋতাকে। সকাল হতেই মলিনা দেবী ছুটলেন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা করতে। সন্ন্যাসী তো সব শুনে অবাক। বললেন—এমন তো হবার কথা নয়, ওর গলায় তো আমার দেওয়া রক্ষামন্ত্র আছে।

কাঁদতে কাঁদতে মলিনা দেবী বললেন—সেটা আর নেই বাবা। আমার দোষেই গেছে।

—সেকি—! কি ভাবে! খুব বিরক্ত হলেন সন্ন্যাসী।—মায়ের মন্ত্রঃপূত ফুল দিয়ে আমি ওর গলায় রক্ষামন্ত্র দিয়েছিলাম।

মলিনা দেবী কাঁদতে লাগলেন। বললেন—ঋতার গলায় সুতোটা একটু ছোট হয়ে গিয়েছিল। আমি রাত্তিরে খুলে রেখে জানলার ধারে রেখেছিলাম। মনে করেছিলাম সকাল হলে ওটা ঠিক করে পরিয়ে দেব। আমাদের বাড়িতে মেঠো ইঁদুরের বড় উৎপাত মহারাজ। হরদম এটা-ওটা টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু আমার একবারও মনে হয়নি এই ফুলটাও ইঁদুর খেয়ে ফেলতে পারে।

সন্ন্যাসী গম্ভীর হয়ে কি ভাবলেন। তারপরে বললেন—এখন ঋতাকে মুক্ত করতে গেলে একমাত্র উপায় মারণ যজ্ঞ। আর একটা কাজ তোমাদের করতে হবে মা—ভুজঙ্গবাবুকে খুঁজে বার কর। বল, যজ্ঞের সময় জয়ন্তীর গয়নার বাক্সটা নিয়ে তাকে হাজির থাকতে।

মণীশবাবু বিশ্বাস করুন বা না করুন মেয়ের জন্য তাকে যেতেই হল কলকাতায় মৈনাকবাবুর কাছে। তাঁকে সব কথা বলতে মৈনাকবাবু বললেন—ঠিক আছে। ভুজঙ্গ আমার অফিসের জুনিয়ার, ওকে সব কথা বলে আমি কাল সকালেই আপনাদের কাছে পৌঁছে যাব। চিন্তা করবেন না। আপনি ফিরে যান—ঋতা মা-র যেন কোনো ক্ষতি না হয়।

খবর রটে গেল গ্রামময়। মণীশবাবুর বাড়ির সামনে লোক ভেঙে পড়েছে। মারণ যজ্ঞ দেখার জন্যে সকলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এ সব যজ্ঞ বাড়ির ভেতরে হয় না। তাই উঠোনেই যজ্ঞের আয়োজন হয়েছে। ইঁট দিয়ে ঘিরে তৈরি হয়েছে হোমকুণ্ড। তার একপাশে সন্ন্যাসী—অন্য পাশে ঋতা। ঋতা খুব অস্থির। তার চোখ দুটো ঘুরছে এদিক-ওদিক। ওকে ধরে বসে আছেন মণীশবাবু আর মলিনা দেবী। শুরু হল যজ্ঞ। দাউ দাউ করে ধরে উঠল হোমের আগুন। সন্ন্যাসী মন্ত্র পড়ে একটা করে ঘি মাখানো বেলপাতা ঐ আগুনে ছুঁড়ে দিচ্ছেন আর প্রত্যেকবার ঋতা কেঁপে কেঁপে উঠছে। পালাবার

চেষ্টা করছে। কিন্তু সন্ন্যাসীর মন্ত্রবলে পারছে না। যজ্ঞ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী একটা পোড়া জ্বলন্ত কাঠ হাতে তুলে নিলেন। উঠে দাঁড়ালেন। ঋতার কাছে এগিয়ে এলেন। ঋতা যে ভয় পেয়েছে বোঝা গেল।

সন্ন্যাসী পোড়াকাঠ হাতে তুলে ঋতার দিকে আগিয়ে এনে বললেন—তুই কে বল।

—আমি জয়ন্তী। ঋতা উত্তর দিল।

—শোন জয়ন্তী, তোমার সমস্ত গয়না রয়েছে তোমার স্বামীর কাছে। একটাও খোয়া যায়নি। তবে এসব পার্থিব বস্তু। আর তোমার ভোগে লাগবে না। এখনও তুমি 'এর মায়া করছ কেন? তার চেয়ে নিজের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা কর। তুমি লোভ-মোহ ত্যাগ করে মনটাকে তুলে নাও পৃথিবী থেকে, তবেই তোমার মুক্তি। দেখবে মুক্তি পেলে তুমি কত শান্তি পাবে। আর এরকম নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে না। তুমি ফিরে যাও জয়ন্তী। ঋতার সর্বনাশ কোর না।

সন্ন্যাসী দেখলেন ঋতার মধ্যে কোনো পরিবর্তন এলো না। রূঢ় হলেন সন্ন্যাসী। ভুজঙ্গবাবুর দিকে ফিরে বললেন—বাক্সটা খুলে ওর গয়নাগুলো ওকে দেখান।

ভুজঙ্গবাবু ঋতার সামনে দাঁড়িয়ে গয়নার বাক্সটা খুলে দেখালেন। ঋতার চোখ দুটো ধক ধক করে জ্বলে উঠল আনন্দে। সন্ন্যাসী বললেন—গয়নাগুলো তুমি নেবে? নিতে পার। নাও।

ঋতা গয়নাগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। সন্ন্যাসীর কথায় মাথা নেড়ে জানাল সে গয়না নেবে না। খুশি হল সন্ন্যাসী। বললেন—তাহলে শোন। দশ গোনার সঙ্গে সঙ্গে যদি ঋতাকে ছেড়ে না দাও তবে এই জ্বলন্ত পোড়া কাঠ তোমার পিঠে পড়বে। আর শুনে রাখ, না ছাড়লে আমার মন্ত্র তোমাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলবে। হাজার মুক্তি চাইলেও আর কোনোদিন মুক্তি পাবে না। আমি গুনতে শুরু করছি। এবার দেখ তুমি কি করবে। সন্ন্যাসী চেঁচিয়ে বললেন—সবাই বল এক। সকলে চেঁচিয়ে উঠল এক বলে। একটু সময় নিয়ে সন্ন্যাসী বললেন, দুই। সমবেত জনতাও চিৎকার করে উঠল দুই বলে। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সকলে—কি হয়। জয়ন্তী ঋতাকে মুক্তি দেবে তো?

সন্ন্যাসীর সমস্ত শরীর রাগে লাল হয়ে গেছে। তিনি চেলাকাঠটা তুলে ঋতার কাছে আসতে আসতে বলে ওঠেন—সবাই বল, সাত। সকলে চিৎকার করে ওঠে, সাত। হঠাৎ একটা শোঁ শোঁ শব্দে সব থমকে গেল। গাছের মাথাগুলো জোরে জোরে দুলতে লাগল। অথচ নীচে কোনো হাওয়া নেই। মণীশবাবুর মনে পড়ল সেই আলেয়ার দিনের কথা। ঋতা অজ্ঞান হয়ে এলিয়ে পড়ল মণীশবাবুর কোলে। একটা ঝনঝন শব্দ। কেউ যেন ভুজঙ্গবাবুর হাত থেকে ফেলে দিল গয়নার বাক্সটা মাটিতে। দু-চারটে গয়না ছড়িয়ে পড়ল। ভুজঙ্গবাবু তুলতে যাচ্ছিলেন, সন্ন্যাসী ইশারায় বারণ করলেন। দেখা গেল, কোন এক অদৃশ্য শক্তি গয়নাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। গলার হারটা শূন্যে উঠে দুলতে লাগল। কেউ যেন গলায় পরে দেখল। কিন্তু মন ভরল না। সব গয়না

একে একে বাক্সয় ভরল কেউ। ডালা বন্ধ করল। তারপর বাক্সটা উঠে এল ভুজঙ্গবাবুর হাতে। দর্শকরা নির্বাক। এসব যে জয়ন্তীর অশরীরী আত্মাই করছে তাতে কোনো আর সন্দেহ রইল না কারোর মনে। সন্ন্যাসী মন্ত্রঃপূত জল ছিটিয়ে দিলেন ঋতার গায়ে। চোখ মেলে তাকাল ঋতা। এত লোক দেখে ভয় পেয়ে গেল। মাকে জড়িয়ে ধরে বলল—মা, আমি এখানে কেন?

মলিনা দেবী মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—না মা, ওসব কিছু না—আমরা একটু হোম করলাম। তুমি মা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম কর।

ঋতা প্রণাম করতেই সন্ন্যাসী মলিনা দেবীকে বললেন—ওকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিন। ওর একটু বিশ্রাম দরকার।

ভুজঙ্গবাবু, মৈনাকবাবু ফিরে যাবার আগে মণীশবাবুকে বললেন—যাক্, সব সমস্যার সমাধান হল তাহলে।

ভুজঙ্গবাবু বললেন—কিন্তু একটা সমস্যা তো রয়েই গেল।

মৈনাকবাবু বললেন—কি বলুন তো?

ভুজঙ্গবাবু বললেন—কেন আলেয়া? যেটা দেখে আমি ডাকাত আসছে বলে মনে করেছিলুম—আর তাইতেই তো এতবড় সর্বনাশটা হয়ে গেল।

ভুজঙ্গবাবুর চোখের কোণ দুটো জলে চিকচিক করে উঠল।

মণীশবাবু ভুজঙ্গবাবুর পিঠে হাত রেখে বলে ওঠেন—এটা কিন্তু কোনো সমস্যা নয় ভুজঙ্গবাবু—যদি মনে করতে পারেন এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য।

ভুজঙ্গবাবু আর মৈনাকবাবু দুজনেই একসঙ্গে মাথা নেড়ে বলে ওঠেন—ঠিক বলেছেন, একদম ঠিক।

দানব

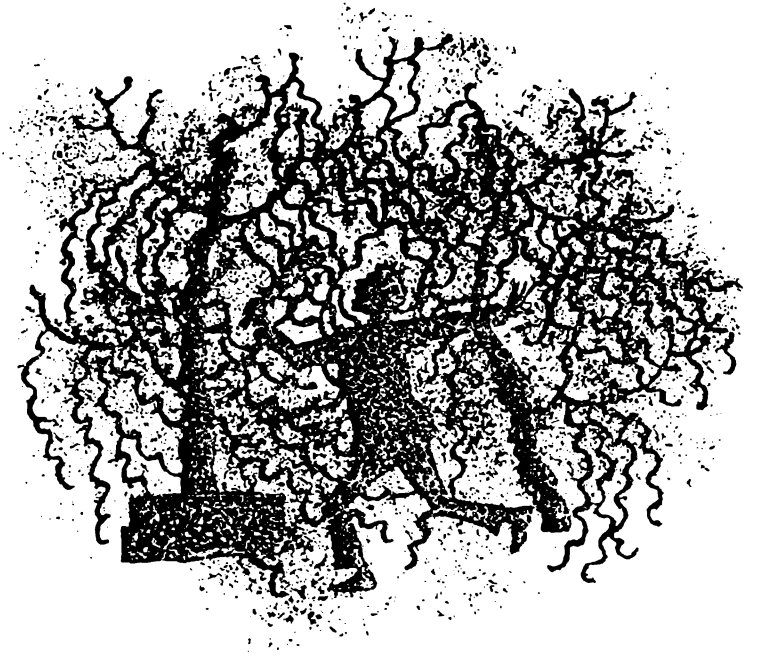

মুরলীমোহন দত্ত কলেজের প্রাক্তন ছাত্র মানব হাজরা এখন ঐ কলেজেরই বোটানির প্রফেসার। ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে তাঁর অপূর্ব পড়ানোর জন্য। মানুষটা রীতিমতো বিশাল জ্ঞানের অধিকারী। সেই সঙ্গে ঘৃণাও করে সবাই ওঁর খিটখিটে রগচটা মেজাজের জন্য। মানুষটা বড় দুর্মুখ। কিন্তু গাছের ব্যাপারে যেমন সিরিয়াস তেমনি পাগল। বিয়ে-থা করেননি। নিজের বলতে কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছে নিতাইদা। নিতাইদার পরিচয় পুরনো চাকর হিসেবে। কিন্তু আসলে নিতাইদাই হলেন প্রফেসর দত্তের একমাত্র অভিভাবক। চারদিকে নিতাইদার প্রখর দৃষ্টি। খাওয়া থেকে শুরু করে শোয়া পর্যন্ত নিতাইদার পরামর্শ মতো প্রফেসার চলেন। অবশ্য আর একজন আছে। একটা বিশাল শিকারী ডোবারম্যান কুকুর। সারারাত সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয় আর সারাদিন বসে বসে ঘুমোয়। প্রফেসারের বাড়ির পাঁচিলটা উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। বাইরের কেউ চট্ করে ঢুকতে পারবে না। কিন্তু এসবের কি দরকার ছিল একটা ব্যাচেলার লোকের জন্যে! দরকার যে ছিল তা বাইরের লোক বুঝতে পারবে কি করে, তারা

যদি জানত প্রফেসরের গাছের কথা—তাহলে বুঝতে পারত, পাহারার কেন দরকার।

আগেই বলেছি, গাছ গাছ করে লোকটা ছিল পাগল। বাড়িতে যে কতধরনের গাছের মেলা সে না দেখলে বোঝা যাবে না। বাড়িভর্তি শুধু গাছ আর গাছ। কোনোটা লতানে, কোনোটা গুল্ম, কোনোটা পাথরকুচি, কোনোটা ক্যাকটাস—সে যে কতধরনের গাছ, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। পৃথিবীর এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরে প্রফেসার গাছ নিয়ে আসেন। প্রত্যেকটা গাছ যেমন দামী তেমনি দুষ্প্রাপ্য। তবে সাধারণ গাছ খুব কম। বিশেষ করে প্রফেসরের বিরাট গবেষণাগারে যে গাছগুলো রাখা আছে দেখলে ভয় করে। কোনোটার পাতাগুলো এত বড় যে, যে কোনো মানুষ তার আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারে। আর একটা গাছের পাতা দেখে মনে হয় যেন সরু সাপ কিলবিল করছে। কম করে আট হাত লম্বা সরু পাতাগুলো। অক্টোপাসের পায়ের মতো যে কোনো মানুষকে দড়ি দিয়ে বাঁধার মতো বেঁধে ফেলতে পারে। কোনোটা বুঝি আফ্রিকার, কোনোটা অসমের, কোনোটা ইন্দোনেশিয়ার। যে কেউ এলেই প্রফেসর আগে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁর গাছ দেখান। তবে গবেষণাগারে গাছ নিয়ে তিনি কি করেন—সেটা কিন্তু তিনি কাউকে বলেন না।

প্রফেসরের এই রগচটা স্বভাবের জন্যে একদিন একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। ব্যাপারটা আর কিছু নয়। তিনি পরীক্ষায় এক ছাত্রকে ফেল করিয়েছিলেন। ছেলেটি শুধু মস্তান নয়, খুব খারাপ ধরনের ছেলে। প্রতি বছরই সে ফেল করছে কিন্তু তাতে তার কোনো লজ্জা নেই। ফেল করলে বলে, কি হবে পাশ করে? আমি তো বেশ ভাল আছি। কলেজের প্রিন্সিপ্যালও জানেন ছেলেটাকে। কোনোদিন কিছু বলা যাবে না। টি. সিও দেওয়া যাবে না। কারণ এই কলেজের খরচের অনেক টাকাই দেন বিরাট ব্যবসাদার কোটিপতি আবার কলেজের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান রুদ্রপ্রসাদ সেন। তাঁরই ছেলে বিনায়ক।

ঝামেলা করলেন প্রফেসর নিজে। ক্লাসের সব ছেলেদের সামনে চেঁচিয়ে বললেন—এই যে বাবা গণেশচন্দ্র, শিববাবুর ছেলে গণেশবাবু। তা জান কি গণেশের আর এক নাম বিনায়ক। তা তোমার নামটি রাখা কিন্তু সার্থক হয়েছে। পেট-মোটা হাতি-মাথা গণেশ। বাঃ চমৎকার নাম বিনায়ক। খুব বুদ্ধি করে তোমার বাড়ির লোকেরা এ নাম দিয়েছেন বটে। আমি অবশ্য তোমার নামটা বদলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেছি। তোমাকে আমি আজ থেকে গো-বৎস বলে ডাকবো মনে করছি। কেননা হাতিরও বুদ্ধি আছে হে—তার যতটুকু আছে তোমার তার কণাটুকুও নেই। আর পড়ে কি হবে। পড়াশোনা তোমার আর হবে না। তার চেয়ে যাও, বাবার সঙ্গে ব্যবসা কর গিয়ে—অবশ্য তোমার যা সরেস মাথা—তাতে আবার গণেশটাও না উল্টে যায়।

বিনায়কের কান-মাথা গরম হয়ে জ্বলছে। বন্ধুদের সামনে তার মনে হল দও স্যার

তাকে উলঙ্গ করে চাবুক মারছে। বিনায়ক প্রচণ্ড অপমানিত হয়ে সেই মুহূর্তে বেরিয়ে এল ক্লাশ ছেড়ে।

প্রতিজ্ঞা করল—এই অপমানের শোধ সে তুলবে। তাকে অপমান করার ফল পেতে হবে তাঁকে। একবার মনে করল প্রফেসর দত্তের নামে রিপোর্ট করে। কিন্তু বুঝতে পারল তাতে কিছু হবে না—কেননা সকলে জানে তিনি দুর্মুখ হলেও প্রফেসর হিসেবে খাঁটি। মনে করল বাবাকে বলে ওঁর চাকরি খাবে। কিন্তু না। শেষে ঠিক করল—এই জবাব সে নিজে দেবে। দত্ত স্যারকে এর খেসারত দিতে হবে বহু মূল্য দিয়ে।

কলেজ যাওয়া বন্ধ করে বিনায়ক সারাদিন ধরে ঘুরে বেড়াতে লাগল প্রফেসর দত্তের বাড়ির এপাশে-ওপাশে। প্রফেসরের প্রিয় গাছগুলোর কথা, শিকারী কুকুরের কথা আর নিতাইদার কথা—সব ওর প্ল্যানের মধ্যে এসে গেছে। রাতদিন ও ছক কষছে কিভাবে জব্দ করা যায় প্রফেসরকে। একটা ব্যাপারে ও নিশ্চিত প্রফেসারের সবচেয়ে প্রিয় প্রচুর দামী-দামী গাছ। ওগুলোকে যদি ধ্বংস করে দেওয়া যায় তাহলেই প্রফেসার শেষ। কিন্তু করবে কি করে? ঐ কুকুরটা তো পেলে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে খাবে। কুকুরটা না থাকলে তো ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়ে যেত।

বিনায়ক দিনরাত্তির প্ল্যান করতে লাগল প্রফেসর দত্তকে চরম শাস্তি দেবার জন্যে। রুদ্রপ্রসাদ সেনকে বছরে পাঁচবার-ছ'বার বিদেশ যেতে হয় ব্যবসাসূত্রে। ভাগ্যগুণে পনেরো দিনের জন্যে রুদ্রপ্রসাদ বিদেশ চলে গেলেন। বিনায়ক মনে করল এই সুযোগ, বাবা আসার আগেই কাজ সারতে হবে। বিনায়ক মরিয়া হয়ে উঠল কিছু করার জন্যে। বাবার গাড়ি নিয়ে গাড়ির নীলকাচ উঠিয়ে ও বসেছিল কলেজের একটু দূরে। দেখল প্রফেসর দত্ত এলেন গাড়িতে। ওঁকে নামিয়ে ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে বিনায়কের গাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। ড্রাইভার দাঁড়িয়ে ছিল একটা গাছের তলায়, বিনায়ক ছিল গাড়িতে বসে। দত্ত স্যারের ড্রাইভার বিনায়কের ড্রাইভারকে দেখতে পেয়ে গাড়ি থামিয়ে দিল। তারপর চেঁচিয়ে ডাকল—জগু.....এই জগু। ততক্ষণে গাড়ির কাচ একটু নামিয়ে বিনায়ক লক্ষ্য করতে লাগল কি ব্যাপার। ছুটে গেল জগু। বিনায়কের বাবার ড্রাইভার চিৎকার করে বলে ওঠে, আরে প্রকাশ না তুই? দুজনে কতক্ষণ কথা হল। ওদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে প্ল্যান খেলে গেল বিনায়কের মাথায়। চোখ দুটো তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এই তো প্রফেসারের মৃত্যুদণ্ড ওর হাতের মুঠোয়।

পরের দিন জগুকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে গাড়ি নিয়েই অপেক্ষা করতে লাগল বিনায়ক। গতদিন ঠিক যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল আজও সেখানে দাঁড়াল, ঠিক এই জায়গাটায় কলেজের কারো দৃষ্টি পড়া প্রায় অসম্ভব। আজ একটু দেরি করেই এল প্রফেসারের গাড়িটা। তারপর প্রফেসারকে নামিয়ে গাড়িটা ঘুরতেই জগু গাড়ির সামনে হাত তুলে

দাঁড়াল। গাড়িটা এক জায়গায় রেখে প্রকাশ নেমে এল গাড়ি থেকে। বলল—জগু, কতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল বল তো। খুব ভাল লাগছে।

জগু বলল—আগে বল আমাদের গ্রামের খবর কি।

—তুই তো সবে এসেছিস ; জানিস আমি তো আজ ছ'মাস বাড়ি যেতে পারিনি।

জগু বলল,—সব ঠিক আছে রে। আসবার সময় দেখে এসেছি মাসিমাও এখন উঠে চলে বেড়াচ্ছে।

জগু আর প্রকাশ দুই বন্ধু। একই গ্রামের ছেলে। জগু যখন কলকাতায় চাকরি পায় তখন প্রকাশ দুর্গাপুরে কাজ করছে। কিন্তু দুর্গাপুরের চাকরিটা এক বয়স্ক মানুষের। মানুষটা মারা যেতে ওর চাকরি চলে যায়। ঠিক সেইসময় ও যখন গ্রামে ফিরে আসে তখন কলকাতা থেকে ওর কাকা গ্রামে যায় পুজো উপলক্ষে। প্রকাশ কাকার কাছে চাকরির কথা বলতে, ওর কাকা প্রফেসারের ঠিকানা দেন। প্রফেসার নাকি শিক্ষিত ড্রাইভার খুঁজছিলেন। প্রকাশের কাকার গাড়ি সারানোর গ্যারেজ আছে—তাই খবরটা পায়। প্রকাশ পরের দিনই কাকার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসে আর প্রফেসারের চাকরিটা পায়। প্রকাশ বলল, ও স্কুল ফাইন্যাল পাশ শুনেই প্রফেসর এক কথায় রাজি হয়ে যান। প্রফেসরের একটা মস্ত বড় আকর্ষণ হল গাছ। যে আসে বাড়িতে উনি সবাইকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাছ দেখান। যদি কেউ উৎসাহ না দেখায় তিনি আর তাকে বাড়িতে ঢুকতে দেন না।

বিনায়ক জিগ্যেস করল—ঐ কুকুরটার কথা বল তো।

প্রকাশ দু'হাত নেড়ে চোখ বড় করে বলল—বাবা.....কুকুর তো নয় যেন বাঘ। তবে হ্যাঁ ট্রেনিং পাওয়া তো। নিতাইদা যদি কাউকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে বলেন—এ আমাদের বন্ধু, তাকে চিনে নেয়, আর কিছু বলে না।

জগু বিনায়কের কথামতো বলল—প্রকাশ, ইনি আমার মনিবের ছেলে। ইনি সাত দিনের জন্যে তোর গাড়িটার দায়িত্ব নিতে চান। মাত্র সাতদিন। এর জন্য তুই মোটা টাকা পাবি।

একটু চুপ করে থেকে প্রকাশ বলল, অন্য কেউ বললে রাজি হতাম না—শুধু আপনি বলছেন বলে.....। কারণ আমি জানি আপনি আমার চাকরি খাবেন না। আর দ্বিতীয়ত, শুনেছি আমার মাসি খুব অসুস্থ, উনি বর্ধমানে থাকেন—তাহলে এই সুযোগে আমি একটু মাসিকে দেখে আসব। তারপর সোজাসুজি প্রশ্ন করে বিনায়ককে—এর জন্যে আপনি কত টাকা দেবেন?

প্রকাশ বিনায়কের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বলল—আপনার কথা শুনে তবে হ্যাঁ না বলব।

বিনায়ক হাসল।—তুমি তো দারুণ প্রফেশানাল হে। বেশ তুমিই বল তুমি কত টাকা চাও।

প্রকাশ বিনা ভণিতায় বলে—পাঁচ হাজার।

জগু বললে—এই। একটু বেশি হল না!

প্রকাশ বলল—এর কম এসব দু'নম্বরি কাজ হয় না রে। ভবিষ্যতের কথা ভাব। আমি যতক্ষণ না জয়েন করছি ততদিন তো পকেট থেকে টাকা বার করে খরচ চালাতে হবে। এটা আমি করব কোন স্বার্থে?

—ঠিক। তুমি ঠিক বলেছ প্রকাশ। শোন প্রকাশ, পাঁচ নয় আমি তোমাকে দশ হাজার টাকা দেব। তুমি কিন্তু তোমার দায়িত্বে আমাকে ওখানে ঢোকাবে। কারও যেন সন্দেহ না হয়। বুঝেছ?

প্রকাশ একগাল হেসে বলল, ছোটবেলায় আমাদের গ্রামে যাত্রা হত। আমি কিন্তু তাতে অভিনয় করে দারুণ নাম করেছিলাম।

—ঠিক আছে। তাহলে কাল সকালে ঠিক এইসময় এখানে আমার সঙ্গে দেখা করছ। ঠিক আছে। তারপর তোমার সঙ্গে আমি যাচ্ছি তোমার ঘরে—। তারপর.....

—হ্যাঁ এরপর প্রফেসারকে বোঝাতে হবে যে আপনি আমার ভাই—বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে আমার বাবা একবার আমায় ডেকেছেন একটা কাগজে সই করার জন্যে—সে-ক'দিনের জন্যে আমার ভাই বিকাশ চালিয়ে দেবে।

—বাঃ গুড্। তাহলে ঐ কথা রইল। কাজ শেষ হলেই টাকা.....ঠিক আছে?

—বেশ। কাল তাহলে আমি আসছি।

পরদিন প্রকাশ এসে জগুর সঙ্গে গাড়ির কাছে যেতেই চমকে উঠল। এ আবার কে রে বাবা! বিনায়ক দাদা কি অন্য লোক পাঠালেন!

হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে ছিল প্রকাশ। ছদ্মবেশী বিনায়ক বলল—কি হল প্রকাশ? চিনতে পারছো না?

প্রকাশ অবাক হয়ে বলল, দারুণ সেজেছেন দাদা। একদম চেনা যাচ্ছে না।

বিনায়ক জগুর হাতে এক বান্ডিল টাকা দিয়ে বলল—মুখ বন্ধ জগু। বাবা যদি ফোন করেন বলবি কলেজের ছেলেদের সঙ্গে বাইরে গেছে।

—ও আমি ঠিক ম্যানেজ করে নেব দাদাবাবু।

—বেশ। চল প্রকাশ, আমরা যাই।

বিনায়ককে নিয়ে প্রকাশ প্রথমেই গেল নিতাইদার কাছে, নিতাইদা সবকথা শুনে বলল, বেশ, বিকেলে যখন বাবু কলেজ থেকে ফিরে যাবেন তখন ওকে নিয়ে এস। দেখ বাবু কি বলেন।

বিকেলে বোধহয় নিতাইদা প্রফেসার দত্তকে সবকথা বলে রেখেছিল। কুকুরটা দিনের বেলায় ঘুমোয় ওর নিজের ঘরে। তাই দেখা হল না বিনায়কের। প্রফেসার শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ করছিলেন বিনায়ককে। ভেতরে ভেতরে অস্বস্তি হলেও সামনে সেটা প্রকাশ করল না বিনায়ক।

প্রফেসর দত্ত জিগ্যেস করলেন—নাম কি?

—বিকাশ—বিকাশ মণ্ডল।

—হুঁ, লেখাপড়া?

—স্কুল ফাইন্যাল পাশ।

বিনায়কের কথা শুনে প্রফেসারের চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল। বললেন—কোন ডিভিশান ছিল?

একটু ভয় পেল বিনায়ক। যদি সার্টিফিকেট দেখতে চান। চট করে বলল—আমরা তো তেমন সাহায্য পাই না—রেজাল্ট কি করে ভাল হবে বলুন—তবে একটা কথা বাবু—আমি উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বরাবর ভাল নম্বর রেখেছি। কেন জানি না এই সাবজেক্টটা আমার বড় ভাল লাগে।

চনমনে করে উঠলেন প্রফেসর।—আমি তোমাকে রোজ রাত্তিরে যতদিন না প্রকাশ আসে উদ্ভিদ বিজ্ঞান নিয়ে অনেক কিছু শিখিয়ে দেব। তুমি রাজি আছ?

খুশি হয়ে বিনায়ক বলে ওঠে—খুব রাজি স্যা.... বাবু। স্যার বলে ফেলছিল আর একটু হলে।

খুশি হয়ে প্রফেসার বললেন—বেশ, প্রকাশ তুমি তাহলে সাতদিনের জন্যে ঘুরে এস। তা হ্যাঁ হে, এ লোকটা গাড়ি-টাড়ি চালাতে জানে তো? না আমার গাড়িতে হাত পাকাবে?

বিনায়ক চট্ করে বলে বসে—না-না স্যা.....বাবু—আমি এর আগে একবার কলকাতায় ছিলাম ছ'মাস। তখন আমার বন্ধুর ট্যাক্সি চালাতাম।

—বেশ—যাও কাল সকাল থেকে ডিউটি করবে। নিতাই প্রকাশকে কিছু টাকা দিয়ে দে। যাও প্রকাশ, ওকে নিয়ে ঘরে যাও। আর একটা কথা শোন—রাত্তিরে যখন তুমি আমার কাছে আসবে, নিতাইকে ছাড়া আসবে না। নিতাই তোমাকে আমার ঘরে পৌঁছে দেবে, আবার বার করেও নিয়ে যাবে। নয়তো জুডো তোমাকে ছিঁড়ে খাবে।

—ঠিক আছে.....বাবু।

স্যার বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল বিনায়ক। ঘর বিছানা দেখে কান্না পেল বিনায়কের। অত বড়লোকের ছেলে শেষ পর্যন্ত তক্তাপোশের ওপর শতরঞ্জি পেতে শোবে? বিনায়ক ভাবল, মাত্র তো সাতদিন, যা হোক করে কেটে যাবে। আগে তো প্রফেসারকে শেষ করি।

পরদিন সকাল থেকে ডিউটি শুরু হল। প্রকাশ চলে গেছে। টাকাও পেয়ে গেছে। এখন বিনায়কের পরের চিন্তা হল কি ভাবে গাছগুলোকে শেষ করা যায়।

বিকেলে কলেজ থেকে প্রফেসার আসবার সময় উনি বলে দিলেন—শোন হে, সাতটা নাগাদ নিতাই যাবে। তোমাকে নিয়ে আসবে। আবার ঠিক আটটা নাগাদ তোমাকে পৌঁছে দেবে।

—ঠিক আছে বাবু।

ঠিক সাতটা নাগাদ নিতাইদা এসে হাজির। জুডো সারা বাড়ি পাহারা দেয় সন্ধ্যে ছ'টা থেকে পরের দিন ছটা পর্যন্ত। সুতরাং খোলাই ছিল।

নিতাই বিনায়ককে নিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল বিনায়কের। কেউ পেছন থেকে ওকে ধাক্কা দিয়েছে। পেছন ফিরে দেখে জুডো। হায়নার মতো চোখটা জ্বলছে। বিশাল সাইজ। পেছন থেকে সামনের দুটো পা দিয়ে ও নতুন লোককে ধাক্কা মেরেছে। নিতাইদা ছিল বলে। নয়তো নিঃশব্দে এসে আগে পায়ে কামড় বসিয়ে দিত।

নিতাইদা কপট রাগ দেখিয়ে বলল—এই জুডো—দেখছিস না, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

জুডো যেন সব কথা বুঝতে পারল। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

বেশ চিন্তায় পড়ল বিনায়ক। নিতাইদা আর জুডো এদের পেরিয়ে তবে তো গাছ! কি করে এদের এড়ানো যায়! ঝোঁকের মাথায় প্ল্যান করে ঠিক কাজ করেনি ও। নিতাইদার সঙ্গে একটা বড় হলঘরে পৌঁছল বিনায়ক। চারদিকে বিশাল বিশাল গাছ। মাঝে প্রফেসারের জিনিসপত্র। প্রফেসার একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে নীল রং-এর কি যেন ফেলছিলেন। বিনায়ককে দেখে বললে—এস। এই দেখ আমার সাঙ্গোপাঙ্গ। আমার বন্ধু—আমার আত্মীয়। আমার যত গল্প সব এদের সঙ্গে।

—কিন্তু এরা.....? বিনায়ক একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে ফেলে।

ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেন প্রফেসর।—হ্যাঁ, এরা সব জীবন্ত। এরাও প্রাণী। জানো তুমি অসংখ্য জীবন্ত কোষ দিয়ে গাছের শরীর তৈরি হয়েছে। প্রোটোপ্লাজম জানো তো! ডিমের মতো নিউক্লিয়াসকে সেলওয়াল দিয়ে ঘিরে রেখেছে। নিউক্লিয়াসের মধ্যে পাবে ক্রোমোজম। মানুষের বেলা আমরা কি বলি, এটা ওর জিনে আছে ও এমনটি হবেই। গাছেদের বেলাতেও সেই এক ব্যাপার। এই ক্রোমোজমই একটা গাছের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার সন্তানদের মধ্যে পাচার করে। আবার এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়োলাই। কোনো কোনো কোষে থাকে জীবন্ত ছোট কণিকা। এদের বলে পামটিভ্। এতদূর বলে তাকালেন প্রফেসর বিনায়কের দিকে। কি বিকাশ, শক্ত লাগছে খুব?

—না না—খুব ভাল লাগছে। আচ্ছা স্যা.....বাবু—এরা কি সব বুঝতে পারে?

—পারে বৈকি। শোন বিকাশ, প্রোটোপ্লাজমের গুণই হল চেতনা। বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে এরা সব বুঝতে পারে ; শুধু বলতে পারে না। এরা খাওয়া-দাওয়া করে, বংশবৃদ্ধি করে। আর জানো কি গাছ মাংসও খায়?

বুকটা ধড়াস করে উঠল বিনায়কের। লোকটা কি পাগল নাকি—বলে কি গাছ মাংস খায়!—শোন তবে, কোন কোন গাছ মাংস খায়। সী-স্কোয়ার্ট, ডারাটম গাছগুলো কিন্তু চলাফেরাও করে আবার পোকামাকড়, ফড়িং, প্রজাপতি সব খায়। কারণ এদের চাই প্রোটিন জাতীয় খাদ্য। পাতাগুলো এমন করে তৈরি হয় যে অনায়াসে জিভে করে শিকার ধরে নেয়।

আবার পিচার প্ল্যান্ট কি করে জানো! পাতায় পাতায় কলসি তৈরি করে রাখে। কলসিটা থাকে রসে ভরা আর ছোট ছোট লোমে ভর্তি। মুখের ঢাকনাটা এরা খুলে রাখে। ঢাকনার রংটা হয় গোলাপী। ঐ রং দেখে পোকামাকড় এগিয়ে আসে কলসির ভেতরে রস খাবে বলে--আর অমনি কলসির ঢাকাটা বন্ধ হয়ে যায়। ব্যস আর বেরতে পারে না। মরে যায়। তখন গাছ ওটা খেয়ে নেয়। আরো আছে এমন গাছ—ব্লাডার ওয়াট্, ইউটিকুলারিয়া, ভেনাসেস্ ফ্লাইট্র্যাপ—এমন কত।

শোন, আজ রাত হয়ে গেছে। তুমি যাও। কাল বিকেলে এলে তোমায় দেখাব আমার দানব বন্ধুদের। এদের ওষুধ দিয়ে আমি বিশাল করে তুলেছি। চোর খুনি ডাকাতদের আর ফাঁসি দিতে হবে না। গাছের মুখে ফেলে দিলে গাছই খেয়ে নেবে। হো হো করে হাসলেন প্রফেসর। নিতাই এসে দাঁড়াল। বলল, চল।

এ সে কি দেখল আর শুনল! রীতিমতো ভয় করছে বিনায়কের, মনে হচ্ছে রাক্ষসপুরীতে এসে পড়েছে। আর প্রফেসর হচ্ছে দৈত্য। দৈত্যকে বধ করতে গেলে অস্ত্র চাই। ফেরার সময় দেখা গেল দরজা আগলে বসে আছে ডোবারম্যান জুডো। হিমশীতল দৃষ্টি নিয়ে তাকাল ওর দিকে। বিনায়ক সাহস আর মনের জোর হারিয়ে ফেলছে। মনে করল, দরকার নেই এসবের। কালই পালাবে। পরক্ষণেই মনে পড়ল বন্ধুদের সামনে তার অপমানের দৃশ্যটা। নাঃ ক্ষমা নয়--এর প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে। কিন্তু কি করে! সময় লাগবে। কিন্তু ক'দিন? দু'দিন তো কেটে গেল। সাতদিন পরে প্রকাশ আসবে। তারমধ্যে ওকে কাজ সারতে হবে। বিনায়ক সুযোগের অপেক্ষায় রইল। সুযোগ এসে গেল খুব তাড়াতাড়ি। একটা ঠিকে লোক ঘর মুছে দিত প্রফেসারের। হঠাৎ বিনায়কের কাছে এসে বলল—নিতাইদা একবার ডাকছেন। তখন বিকেল পাঁচটা। বিনায়ক জানে সন্ধে ছ'টার আগে জুডোর চেন খুলে দেওয়া হয় না—তাই বেশ নির্ভয়ে নিতাইদার ঘরের দিকে গেল। খুব জ্বর নিতাই-এর। জ্বরের ঘোরে প্রায় জ্ঞানহীন। বিনায়ক কাছে আসতেই নিতাই বলল—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই। বাবুর ল্যাবরেটরিতে একবার যাও। দেখবে একটা তাকে অনেক ওষুধপত্র রাখা আছে। ওখানে দেখবে "প্যারাসেফ" বলে একটা ট্যাবলেট আছে। আমি তো উঠতে পারছি না। ওটা খেলে আমার জ্বরটা কমবে। আমি উঠে জুডোর দুধ-টুধগুলো করব। তুমি একটু এনে দাও। তুমি শিক্ষিত ছেলে বলে ডেকে পাঠালাম। কাজের মেয়েটাকে দিয়ে তো এসব হবে না।

—কিন্তু ঘর তো তালা দেওয়া। বলল বিনায়ক।

নিতাইদার কথা জড়িয়ে আসছে। চোখ বন্ধ করেই বলল --রান্নাঘরে একটা চাবির আলমারি আছে দেখ। সেখানে দেখবে পেতলের একটা চাবি। সেটাই ল্যাবরেটরি ঘরের। যাও, নিয়ে এস তাড়াতাড়ি।

আজকে প্রফেসারের মিটিং আছে। বলেই গেছেন বিনায়ককে সন্ধে সাতটা নাগাদ গাড়িটা নিয়ে যেতে। সুতরাং তাড়া নেই। নিজের বুকের শব্দ নিজে শুনতে পাচ্ছে। ভাবছে এমন সুযোগ বারবার আসে না। ল্যাবরেটরি ঘরের দরজা খুলে ওষুধের তাকের কাছে গিয়ে বিনায়ক দেখল—একটা তাকে ওষুধ ভর্তি। সবকটা শিশির গায়ে ওষুধের নাম লেখা। দেখল, হ্যাঁ, আছে প্যারাসেফ ট্যাবলেট। হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে গিয়ে চোখে পড়ল একটা শিশিতে ভর্তি ঘুমের ওষুধ। হঠাৎ বুদ্ধি খেলে গেল বিনায়কের মাথায়। ঘুমের ওষুধের শিশিটা পকেটে পুরে বেরিয়ে এল ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ করে। রান্নাঘরে দেখে এসেছে এক প্যাকেট দুধ রাখা। ভাবল, দুধটা কার জন্যে তা কায়দা করে জেনে নিতে হবে নিতাইদার কাছে। নিতাই তখন জ্বরের ঘোরে। একটা ঘুমের ট্যাবলেট আর গেলাসে করে জল নিয়ে বিনায়ক মিষ্টি করে ডাকল—নিতাইদা, হাঁ কর, ওষুধ এনেছি।—

নিতাই হাঁ করে ওষুধ খেল। ঠিক সেই মুহূর্তে বিনায়ক জিগ্যেস করল—নিতাইদা—একটা দুধ পড়ে আছে, জ্বাল দিয়ে দেব?

নিতাই জড়িয়ে জড়িয়ে বলল—ওটা জুডোর দুধ—সাতটা নাগাদ খায়। আমি উঠে জ্বাল দিয়ে দেব। ব্যাটা আবার ঠান্ডা না হলে খেতে পারে না।

ঘড়িতে ছ'টা বাজে। বিনায়ক বলল—নিতাইদা, আমি বাবুকে আনতে যাচ্ছি। তুমি শুয়ে থাক।

নিতাই মাথা নাড়ল।

বিনায়ক সোজা রান্নাঘরে গেল। গ্যাসে দুধটা জ্বাল দিল। তার ভেতর ফেলে দিল গোটা দশেক ঘুমের ওষুধ। ফ্রিজ খুলে দেখল, একটা মাছের স্টু করা পাত্র। নিশ্চয়ই এটা প্রফেসারের। বিনায়ক একটা বাটিতে গোটা ছয়েক ঘুমের বড়ি জলে গুলে স্টু-এর মধ্যে ঢেলে দিল। পকেটে হাত দিয়ে দেখল গবেষণাগারের চাবিটা তার পকেটে ঠিক আছে কিনা। তারপর গাড়ি নিয়ে আনতে গেল প্রফেসারকে। গাড়িতে নিতাই-এর কথা বলেই রেখেছিল বিনায়ক। প্রফেসার সব শুনে বললেন—দেখ তো, কি মুশকিল হল! সব খাবার গরম করা, দেওয়া এসব এখন কে করে! জুডোকে নয় আমি খেতে দিয়ে দেব, কারণ ও তো নিতাই আর আমার হাতে ছাড়া কারো হাতে খায় না। কিন্তু আমাকে দেবে কে!

বিনায়ক খুব মিষ্টি করে বলল—বাবু আমি দিলে কি আপনি খাবেন না?

কথাটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যে প্রফেসর আর না বলতে পারলেন না। বললেন—বেশ। ফ্রিজ থেকে খাবার গরম করে আমাকে তুমিই দিয়ে দিও। দেখবে ভাতও আছে সেটাও গরম করে দিও। সাতটা নাগাদ জুডো খায়। আমি খাই রাত নটায়। পারবে তো?

—নিশ্চয়ই স্যা.....বাবু—ঠিক পারবো আপনি একদম চিন্তা করবেন না।

প্রফেসার বাড়িতে নেমে গেলেন। বললেন—বিকাশ তুমি এসো—তাড়া নেই—আমি জুডোকে খেতে দিয়ে লাইব্রেরি ঘরে থাকবো। দেখি আবার নিতাইটা কেমন আছে।

বুকের মধ্যে যেন ট্রেন চলেছে বিনায়কের।

রাত প্রায় আটটা বাজে। জুডোকে দেখতে পেল না। পা টিপে টিপে নিতাই-এর ঘরের দিকে গিয়ে দেখল লোকটা মড়ার মতো ঘুমচ্ছে। জুডোর ঘরটা দেখা যায় দূর থেকে। প্রফেসার ওকে দুধ খাইয়ে চেন খুলে দিয়েছেন। তারপর তিনি ঢুকে গেছেন গবেষণাগারের মধ্যে। জুডো যে বাগানের দরজার কাছে বসে ঝিমোচ্ছে তা তিনি ভাবতেও পারেননি। গবেষণাগারেই একটা পার্টিশান করা। বিনায়ক যেতেই প্রফেসার বললেন—বলেছিলাম রাক্ষুসে গাছেদের দেখাব—যাদের কথা তোমাকে বলেছি—এই দেখ সেই গাছ। বিনায়ক দেখল কি বিশাল পাতাওলা সব গাছ। সব জীবন্ত। একটা গাছ তার বড় লম্বা পাতাগুলো নাড়াচ্ছে অস্থির হয়ে। যেন সাপের লেজ। আর ওগুলো! বিশাল বিশাল গাছের পাতায় বিশাল এক একটা কলসি। মুখগুলো খোলা। ওঃ এই তাহলে পিচার! বিনায়ক মনে মনে বলল—আজই তোমাদের লীলা শেষ হবে আমার হাতে।

প্রফেসর বললেন, আজ মিটিং করে বড় ক্লান্ত হয়ে আছি। তুমি আমার খাবারটা আমার শোবার ঘরে নিয়ে এসো। শুধু স্টু আর দু'চামচ ভাত—দেখ, পারবে তো।

—নিশ্চয়ই। এ আর এমন কি কাজ! আপনি যান বাবু, ঘরে যান, আমি খাবার গরম করে নিয়ে যাচ্ছি।

—ঠিক আছে, আর শোন।

টেবিল থেকে একটা ট্যাবলেট তুলে নিয়ে প্রফেসর বললেন, এটা নিতাইকে খাইয়ে দিও। আর কাল সকালে তুমি ডাঃ মুখার্জীকে খবর দিও ওকে দেখে যাবে।

সব কিছু মিটিতে মাত্র আধঘণ্টা লাগল। প্রফেসর বললেন, যদি কিছু মনে না কর—তো বলি আজ রাতটা না হয় তুমি নিতাই-এর কাছে কাটিয়ে দাও। তাড়া নেই—খাওয়া-দাওয়া করে এসো।

বিনায়ক অবাক হয়ে গেল। লোকটা কত স্বার্থপর। একবার বলল না বাইরে খাবে কেন—নিতাই তো খাচ্ছে না, দেখ না কি আছে ফ্রিজে, যা আছে এখানেই দুটো খেয়ে নাও।

বিনায়ক ভাবল লাভটা তো তারই হল—আর রাগ করে কি করবে। রাত একটু গভীর হল। প্রফেসরের ঘর থেকে নাকডাকার শব্দ আসছে। নিতাই অচৈতন্য। জুডো মড়ার মতো শুয়ে, কি জানি মরে গেল কি না—এই তো সুযোগ। বিনায়ক রান্নাঘরে গেল। আগেই দেখেছিল ডাবকাটা কাটারি। সেটা নিয়ে নিল—তারপর পকেট থেকে

গবেষণাগারের চাবিটা খুলে ভেতরে ঢুকে পড়ল। ভয়ে আলো জ্বালতে পারছে না যদি হঠাৎ কেউ এসে পড়ে ওকে ধরে ফেলে। হাতড়াতে হাতড়াতে এগোতে লাগল বিনায়ক। অন্ধকারে বড় গাছগুলোর ছায়াগুলো দেখে ভয় করে।

লম্বা লম্বা পাতা নাড়িয়ে গাছটা সাপের মতো লক-লক করছিল—হাতের কাটারিটা শক্ত করে ধরে বিনায়ক সাপের লেজের মতো পাতায় মারল এক কোপ। অন্ধকারে একটু সয়ে এসেছিল, বিনায়ক পরিষ্কার দেখল পাতার গা বেয়ে রক্ত পড়ছে। ভয় পেয়ে আরো জোরে মারতে লাগল বিনায়ক। মেরেই চলেছে গাছের পর গাছ। প্রফেসরের ওপর আক্রোশটা যেন ফুটে বেরোচ্ছে বিনায়কের হাতে। হঠাৎ গলায় একটা চাপ লাগল বিনায়কের। সুযোগ বুঝে কখন গাছের লম্বা একটা পাতা ওর গলায় পাকিয়ে চাপ দিচ্ছে মারবে বলে। হাতের কাটারি দিয়ে ওটাকে কাটবার চেষ্টা করতে লাগল বিনায়ক, কিন্তু পাছে গলা কেটে যায়—জোর করতে পারল না। হঠাৎ অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো একগাদা লম্বা পাতা এসে ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। তারপর ছুঁড়ে দিল বড় বড় কলসির দিকে। কলসিটা শিকার ধরার আশায় বেশ বড় হয়ে গেছে। বিনায়ক কিছু বোঝার আগেই কলসির মধ্যে গিয়ে পড়ল। কলসির ঢাকাটা বন্ধ হয়ে গেল। একরকম লালা জাতীয় রস বেরিয়ে ওকে ডুবিয়ে দিচ্ছে জলের মধ্যে। বিনায়ক চিৎকার করতে গেল—শব্দ হল না। মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল বিনায়কের শরীর।

অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠলেন প্রফেসর। দেখলেন নিতাই, জুডো তখনও ঘুমচ্ছে। বিনায়ককে তিনি তো নিতাই-এর ঘরে থাকতে বলেছিলেন, তাকেও দেখতে পেলেন না। অথচ সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। তবে? কি রকম যেন গোলমাল লাগল প্রফেসারের। দৌড়ে গেলেন ল্যাবরেটরিতে। দরজা খোলা। ধড়াস করে উঠল তাঁর বুক। তাঁর এতদিনের গবেষণা কি শেষ হয়ে গেল? দেখলেন মাটিতে রক্ত, পাশে পড়ে আছে কাটারি। বুঝতে পারলেন একটু পরেই—বিকাশ তাঁর ক্ষতি করতে এসেছিল। কিন্তু কেন? যাই হোক সুখবর হল গাছের তেমন ক্ষতি হয়নি। আবার ওষুধ পেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু বিকাশ এরকম করল কেন?

উত্তরটা পেলেন তিন রাত পরে। গবেষণাগারে কাজ করছিলেন—প্রফেসর হঠাৎ দেখলেন দরজার কাছে কে যেন দাঁড়িয়ে। ভাল করে লক্ষ্য করতেই চিনতে পারলেন। এ তো সেই রুদ্রপ্রসাদ সেনের বখাটে ফেল করা ছেলে বিনায়ক।

চিৎকার করে উঠলেন তিনি—এই এই, এখানে কি করছিস রে?

অশরীরী বিনায়ক এগিয়ে এল প্রফেসরের কাছে। বলল—প্রতিশোধ। আমার জীবনটা শেষ করেছো, তোমার জীবনটাও আমি শেষ করে দেব। প্রফেসর দেখলেন কাটারি

হাতে ছুটে আসছে বিনায়ক। কিছু করার আগেই প্রফেসরের গলাটা কাটারির আঘাতে ঝুলতে লাগল চোট খেয়ে।

পরদিন সকালে পুলিশে পুলিশে বাড়ি ছেয়ে ফেলেছে। তাদের মনে একটাই প্রশ্ন—কে বা কারা এমন করে এই অমূল্য গাছগুলোকে কুটিকুটি করে কেটেছে, আর প্রফেসরকেই বা কাটলো কেন? তবে কাটারিতে যে হাতের ছাপ পেল তা যে নিতাইদার নয়—সেটাও পরিষ্কার করে জানিয়ে দিল ওরা।

সেইদিনই প্রকাশও এসে গেছে। বিনায়কের ব্যাপারটা জানাজানি হল প্রকাশের সাহায্যেই। বিনায়কের আক্রোশের কারণটাও জানা গেল কলেজের বন্ধুদের কাছ থেকে। ব্যাপারটা সবাই বুঝলেও বিনায়কের পরিণতির ব্যাপারটা কেউ ভাবতেও পারল না।

কাটামুণ্ডু

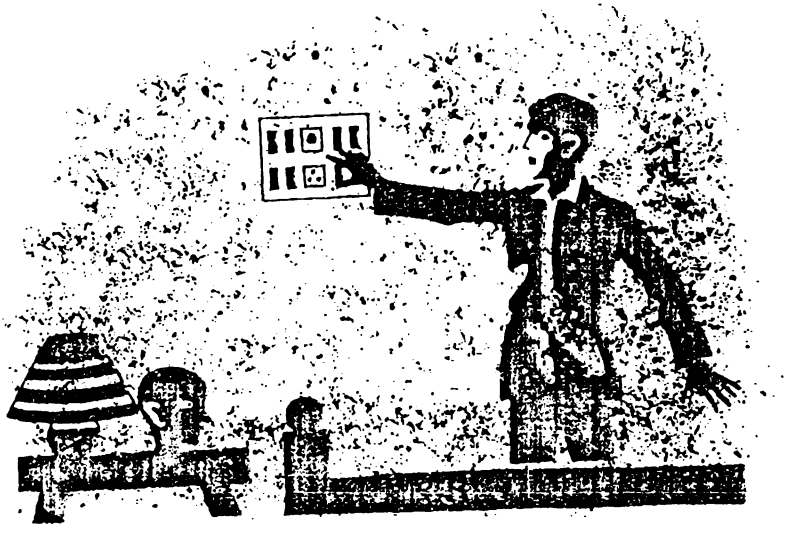

যাকে বলা হয় ইংরাজীতে "জব্ স্যাটিস্ফেকশান"--মানে চাকরির মধ্যে আনন্দ পাওয়া, সেটা চন্দনের একদম নেই। কোথাও কিছু না পেয়ে ওকে এই চাকরিটা নিতে হয়েছিল। কিন্তু একি একটা কাজ? সাধ করে যে কেউ এই চাকরি নিতে পারে--এমন ধারণা সে করতেই পারে না। সারাদিন ধরে খুন-জখম, চুরি-বাটপারির সুরাহা কর আর চোর-বাটপাড়দের সঙ্গে কাটাও--এ কি জীবন? সারাদিন ধরে ডিউটি, সবচেয়ে বাজে লাগে, মানুষের ভাল দিকটাও তো আছে--সে সব না দেখে শুধু মানুষের অপরাধমূলক দিকটাই খুঁজে বেড়াতে হয়। চন্দন থানার বড়বাবু। হ্যাঁ, বলতে, কইতে, শুনতে খুব ভাল--থানার বড়বাবু--ও. সি., অফিসার-ইন-চার্জ। কিন্তু চন্দন জানে এর মধ্য কোনো ভাল নেই। অফিসের টেবিলে বসে এসব চিন্তাই করছিল চন্দন। এমন সময় ক্রিংক্রিং করে বেজে ওঠে সামনের টেলিফোনটা।

--নয়নপুর থানার ও. সি. বলছি। --চন্দন বলে।

--স্যার, শিগ্গির আসুন। খুনের কেস--।

ওদিক থেকে উত্তেজিত কারো কণ্ঠ। হয়তো পারদিক ফোন থেকে ফোন করেছে। একটা গোলমালের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। চন্দন বলল--আপনি কে বলছেন, কোথা থেকে বলছেন? ওদিক থেকে উত্তর আসে--আমি স্থানীয় লোক.....

চন্দন আবার বলে--হ্যাঁ বলুন জায়গাটা ঠিক কোথায়?

—মোহিনীপাড়ায়—ঠিক মাছের বাজারের পাশে।

—ঠিক আছে, যাচ্ছি।

চন্দন ফোন রেখে দুজন হাবিলদার নিয়ে সোজা চলে আসে মোহিনীপাড়ায় জিপে করে। বাজারের দিকে যেতেই চোখে পড়ে গোলমাল আর ভিড়। চন্দন ভিড়ের দিকে এগিয়ে চলে। পুলিশের গাড়ি দেখে লোকজন জায়গা করে দেয়। সামনেই একটা বস্তা পড়ে। চারদিকে কালো কালো ছোপ। বোঝা যায় রক্ত শুকিয়ে ঐরকম দাগ হয়েছে। পচা একটা গন্ধ চারিদিকের বাতাসটাকে বিষিয়ে তুলেছে। চন্দন নাকে রুমাল চাপা দেয়। চন্দন ইশারা করল ওর লোকেদের। বস্তা খোলা হল, দেখা গেল একটা বীভৎস নারকীয় দৃশ্য। কোনো এক অল্পবয়সী যুবককে টুকরে টুকরো করে কেটে বস্তায় ভরা হয়েছে। হাত-পা সব কেটে আলাদা করা—সবচেয়ে সেটা বীভৎস তা হল লোকটির কাটা মুণ্ডুটা। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কিন্তু দেহটা পচে গেলেও মুণ্ডুটার কিছু হয়নি। মুণ্ডুটার দিকে তাকিয়ে চন্দন ভাবছিল, লোকটার বয়স কত হবে, কোন শ্রেণির লোক—এইসব। এমন সময় চমকে উঠল চন্দন। মনে হল মুণ্ডুটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চোখের পাতা পড়ল, ঠোঁট নড়ল, যেন কথা বলার চেষ্টা করছে। একি! চন্দন কি ভয় পেল নাকি! তবে এ সে কি দেখছে? এসব কি তার মনের ভুল! নাঃ, ঐ তো ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো তো এখন বীভৎস লাগছে না। ঐ তো পরিষ্কার চোখের পাতা পড়ল। চন্দনের পুলিশি-জীবনে এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। চন্দন আশেপাশের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখে নেয়, ব্যাপারটা তারাও লক্ষ্য করেছে কিনা। কিন্তু নাঃ, তেমন তো তার মনে হল না। কই লোকটার মুণ্ডুটা তো আর চোখের পাতা ফেলছে না! তাহলে নিশ্চয়ই এসব চন্দনের মনের ভুল। ভুল যদি হবে তো চন্দনের পা কাঁপছে কেন? তবে কি পুলিশের লোক হয়ে তার ভূতের ভয় লাগছে! ছি ছি তা কি করে হয়? এ তো বড় লজ্জার। কড়া গলায় চন্দন হুকুম করে—মৃতদেহ মর্গে পাঠাবার ব্যবস্থা কর।

চন্দন যখন বাড়ি ফিরল, তখন রাত এগারোটা। বাড়িতে তার পিসিমা ছাড়া আর কেউ নেই। খুব ছোটবেলাতেই চন্দনের বাবা-মা চলে গেছেন। তখন এই বিধবা নিঃসন্তান পিসি তাকে কোলে তুলে নেন। চন্দন জানে, বাড়ি গিয়ে দেখবে টেবিলে খাবার রেখে পিসি তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। চন্দন রাগ করে, কিন্তু পিসি শোনেন না। আজও রাগ করল চন্দন।—কতদিন বলেছি পিসি, আমার আসার কোনো ঠিক নেই, তোমার শরীর খারাপ, তুমি আমার খাবার ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়বে, কিন্তু তুমি কিছুতেই শুনবে না।

পিসি এক ধমক দিয়ে বললেন—না শুনবো না। তোমাকে আর মাতব্বরি করতে হবে না। দয়া করে তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসে খেয়ে আমায় উদ্ধার কর।

চন্দনের নাকে যে সেই পচাগন্ধটা লেগে আছে—কিছুতেই যাচ্ছে না। বিশেষ করে কাটামুণ্ডুর জীবন্ত হয়ে ওঠার ব্যাপারটা কিছুতেই তাকে সহজ হয়ে উঠতে দিচ্ছে না।

অন্যদিন পিসির সঙ্গে বকবক করতে করতে খায়। আজ ভাল করে খেতেও পারল না। পিসিমা উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন—দেখ চন্দন, তুই কিন্তু একটু বেশি পরিশ্রম করছিস। এরকম করলে শরীর থাকবে? ভালকথা বলি শোন—ক'দিনের ছুটি নে ; চল আমরা ক'দিনের জন্য পুরী ঘুরে আসি।

চন্দন চিন্তিত মুখে বলে—এখন হবে না গো পিসি, একটা খুনের কেস এসে গেছে, আমাকে বোধহয় কোর্টঘর করতে হবে।

পিসি রাগ করে বললেন—এসব খুনটুন মোটে ভাল নয় চন্দন। তুই অন্য চাকরির চেষ্টা কর। আমার বাপু বড্ড ভয় করছে।

চন্দন একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল—আমিও তাই ভাবছি পিসি—অন্য চাকরির চেষ্টা করতে হবে। তবে পিসি যতক্ষণ চাকরিতে আছি, ডিউটিতে যেতে হবে আমায়। বল?

পিসি বললেন—তা তো বটেই। যা ঠাকুর করবেন। এখন যা বাবা শুয়ে পড়। আবার তো সকাল থেকে ছোটা।

পিসিমা চলে যেতে চন্দন শুয়ে পড়ল। রাত তখন ক'টা কে জানে। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড অস্বস্তিতে ওর ঘুমটা ভেঙে গেল। তার গায়ের ওপর যেন কেউ নিশ্বাস ফেলছে। কাছেপিঠেই কেউ আছে, কিন্তু ও তাকে দেখতে পাচ্ছে না। চিৎকার করে ওঠে চন্দন—কে? কে ওখানে? কই কোথাও তো কেউ নেই। তবে কি সকালের কাটামুণ্ডু দেখার পর চন্দনের অবচেতন মনে ভয় কাজ করছে! ছি ছি, সে না পুলিশের লোক! মনের জোর এনে চন্দন আবার শুয়ে পড়ল। ঘুম এসে গিয়েছিল। হঠাৎ শুনল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে। এবার আর কোনো চান্স নিল না চন্দন। চট করে উঠে ঘরের আলোটা জ্বেলে দিল। কিন্তু ভুল করে বেডল্যাম্পের সুইচটা টিপেছিল। বেডল্যাম্পের আলোয় আধো আলো আধো অন্ধকারে চন্দন চমকে উঠে দেখল, তার সামনের বেডসাইড টেবিলের ওপর বসে আছে কাটামুণ্ডু ; আরও জীবন্ত আরও সজীব। পূর্ণিমা নয় অথচ জানলা দিয়ে কিসের একটা আলো এসে কাটামুণ্ডুটার ওপর পড়েছে। চন্দন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল সুইচবোর্ডের কাছে। মুণ্ডুটার ঠোঁট নড়ে উঠল। বলল—স্যার, আমি আপনার কোনো ক্ষতি করব না। আপনার কোনো ভয় নেই, আপনাকে আমি এই খুনের তদন্ত করতে সাহায্য করব। আপনার চাকরির ক্ষেত্রে সুনাম আসবে। আর আমার একটাই স্বার্থ আমার খুনের হত্যাকারী ধরা পড়ুক—তাদের শাস্তি হোক। আমি শুধু এইটুকু চাই স্যার, আর কিছু নয়।

চন্দনের সেই অস্বস্তিকর অবস্থাটা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছে। চোর খুনি ডাকাত নিয়ে নাড়াচাড়ায় তার অভ্যেস আছে কিন্তু ভূত বা কাটামুণ্ডু নিয়ে সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা—এই তার প্রথম। এজন্যেই প্রথমটা সে থতমত খেয়ে গিয়েছিল। এখন যেন অনেকটা ভরসা পাচ্ছে। চন্দন বুঝল পুলিশে চাকরি করে তার এইটুকুই উন্নতি হয়েছে যে কোনো কিছুর সঙ্গে মোকাবিলা করার ক্ষমতা বেড়েছে। চন্দন ধীরে ধীরে কাটামুণ্ডুর সামনে এসে খাটের ওপর বসল। বলল—হত্যাকারীকে ধরিয়ে দাও বললেই তো আর ধরে দেওয়া যায় না—এরজন্যে খবর চাই।

—আমি আপনাকে সব খবর দেব। ওদের চিনিয়ে দেব।

—আর প্রমাণ? প্রমাণ না পেলে চিনে আমি কি করব! কে আমার কথা বিশ্বাস করবে! অ্যাঁ! প্রমাণ ছাড়া হত্যাকারী ছাড়া পাবে। মধ্যিখান থেকে নিরপরাধ লোককে ধরার অভিযোগে আমার বদনাম হবে, চাকরি যাবে। আর তোমার তাতে কী? তোমার তো কিছুই হবে না। শোন কাটামুণ্ডু, আমাকে খুব ভেবেচিন্তে কাজ করতে হবে।

কাটামুণ্ডু একটু উত্তেজিত হয়ে বলল—আমি জানি স্যার, আপনি যা বলছেন সব ঠিক। আমিও স্যার আইন জানি। আমি সেইভাবেই আপনাকে সাহায্য করব। বুঝতে পারছেন না কেন স্যার, এতে যে আমার স্বার্থ সবচেয়ে বেশি। আমি জীবিত থাকলে—আমি নিজেই ব্যবস্থা নিতুম, কাউকে বলতুম না। কিন্তু আমার ব্যবস্থা নেওয়া আর একজন পুলিশের ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ—তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছি স্যার, আমার আত্মার শান্তির জন্যে আপনি আমার কথাগুলো ভাল করে শুনুন। আমার কথামতো কাজ করুন।

চন্দন কি ভেবে বলল—বেশ বল শুনছি।

ঠিক বোঝা গেল না। কাটামুণ্ডুর মুখে বোধহয় একটা তৃপ্তির হাসি খেলে গেল। কাটামুণ্ডু বলতে লাগল—যেখানে আপনি আমার থলিটা পেয়েছিলেন, তার ঠিক পেছন দিকে অর্থাৎ মাছের বাজারের উত্তর দিক বরাবর গেলে একটা সরু গলি। সেই গলিটার নাম সূর্যচন্দ্র লেন। এইখানেই ছ' নম্বর বাড়িটা আমাদের। বাপ মারা যাবার পর বাড়িটার সব ক'টা ঘর ভাড়া দিয়ে নীচের একতলায় একটা ঘরে আমি থাকতুম। যা ভাড়া পেতুম কোনোরকমে চলে যেত। কিন্তু সে আর কত। ভাবলুম পুরুষমানুষ বিয়ে থা করব। চাকরি না হলে পরিবারকে খাওয়াব কি? তাই চাকরির জন্যে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। একদিন পাড়ার দুটো ছেলে এসে বলল—চল, চাকরি করবি তো চল। একটা কাজ খালি আছে। ভাল মাইনে।

শুনে খুব খুশি হলুম। ওদের সঙ্গে গেলুম যেখানে ওরা নিয়ে গেল। স্টেশনের পেছনে নির্জন জায়গা—সেখানে একটা ভাঙা পুরনো ঘর। কয়েকটা লোক বসে আছে, চেহারা দেখে ভয় করে। ভাবলুম এ কোথায় এসে পড়লুম। তবু ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলুম, কি কাজ?

—কাজ সামান্য। মাল পৌঁছে দেওয়া-নেওয়া।

মাইনেটাও খারাপ নয়। ভাবলুম এখন তো করি পরে বদলে নেব চাকরিটা। এইখানেই ভুল করলুম স্যার। আমি তখনও বুঝতে পারিনি যেখানে ঢুকেছি সেখান থেকে আর কেউ কোনোদিন বেরিয়ে আসতে পারে না। দু'দিনেই বুঝলুম কাজটা কত নোংরা। স্মাগলিং-এর ব্যবসা। সব স্মাগলারদের সঙ্গে কাজ করতে হচ্ছে। ধরা পড়লে জেল। আবার বোঝামো করলুম, কথায় কথায় পাড়ার ছেলে দুটোকে বলে ফেললুম—আগে যদি জানতুম—তাহলে তোদের সঙ্গে কাজ করতুম না। তোদের দেখে তো স্মাগলার বলে মনে হয়নি।

ওদের চোখ দুটো জ্বলে উঠল, কিছু বলল না। সন্ধের পর ডেরায় যেতেই সকলে আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। ওদের যে লিডার জয়নাল আমার চুলের মুঠি চেপে ধরে চিৎকার করে উঠল চাপা গলায়—এই খবরদার। বেইমানি করেছিস তো জানে মেরে দেব। পালাবার যদি মতলব করিস তো জানবি পৃথিবীর যে কোনো কোণ থেকে তোকে টেনে এসে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব। কারো সাধ্য নেই তোকে রক্ষা করবে। মনে রাখিস।

প্রাণের ভয়ে বলে উঠি—এ কি বলছো বস্! আমি এমন কাজ করব কেন?

কথাটা শুনে জয়নাল ইশারা করল ওদের আমায় ছেড়ে দেবার জন্যে। তারপর ধমক দিয়ে বলল—মনে রাখিস কথাটা। জয়নাল পারে না এমন কোনো কাজ নেই।

প্রাণের ভয়ে মুখ বুজে কাজ করতে লাগলুম বটে কিন্তু মন মানতো না।

হঠাৎ কাটামুণ্ডু চুপ করে গেল। চন্দন বলল, কি হল থামলে কেন? বল।

চন্দন দেখল কাটামুণ্ডু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল—পূব আকাশে লালের আভা। চন্দন দেখল ঘড়িতে তখন ঠিক পাঁচটা। বুঝল দিনের বেলা কাটামুণ্ডু দেখা দেবে না। কিন্তু সব তো শোনা হল না। রাত্তিরে আবার আসবে তো, কে জানে। আর ভাবতে পারল না চন্দন। সারাদিনের ক্লান্তি, টেনশান, রাত জাগা, মানসিক চাপ—সব মিলিয়ে তার চিন্তাশক্তিকে যেন ভোঁতা করে দিয়েছে। আলো নেভাবার ক্ষমতাটুকু ওর নেই। বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল চন্দন।

পরদিন কাজের ফাঁকে হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও চন্দনের মনে পড়তে লাগল কাটামুণ্ডুর কথা। আবার আসবে তো! কে জানে—

ভূতটুত সে কোনোদিন বিশ্বাস করেনি, করেও না। কিন্তু এ একটা কি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। বিশ্বাস করতে মন চায় না অথচ অবিশ্বাসই বা করে কী করে। বাড়ি ফিরে আজ তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে সে বিছানায় বসে অপেক্ষা করতে লাগল নাইট ল্যাম্পটা জ্বেলে। বড় আলো জ্বাললে যদি মুণ্ডু না আসে। বেডসাইড টেবিলের দিকে তাকিয়েই সে অপেক্ষা করছিল, হয়তো বা একটু তন্দ্রা মতো এসেছিল। চমকে উঠল চন্দন।

— স্যার, আমি এসেছি, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি!

চমকে তাকিয়ে চন্দন দেখতে পেল, সামনে কাটামুণ্ডু।

বলল—যাক তুমি এসেছো, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি। তারপরই হঠাৎ বলে ওঠে চন্দন—তার আগে বল তো—তোমার নাম কি? আসল কথাটাই তো বলনি।

আমার নাম পল্টু.....পল্টু মান্না। পাড়ার লোকে বলতো পল্টন।

চন্দন বলল, বেশ এবার বল—তারপর কি হল।

পল্টু বলল, আমি ভেতর ভেতর পালাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ওরা বোধহয় সেটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। আমাকে চোখের আড়াল করত না। কোনো মাল দিয়ে পাঠালে আমার চলাফেরা লক্ষ্য রাখার জন্যে অন্য লোকেদেরও বলা থাকত

এটা আমি বুঝতে পারতুম। এ একধরনের বন্দি জীবন, বুঝতে পারলুম—আমি না মরলে ওদের হাত থেকে নিস্তার পাব না। ঝরিয়া কয়লাখনিতে আমার মাসির ছেলে কাজ করত। তার ঠিকানাটা ছিল বাবার ডায়েরিতে। খুঁজতে খুঁজতে সেটা পেয়ে একটা চিঠি ফেলে দিলুম। যদি একটা চাকরি করে দিতে পারে খনিতে। মাস চারেক কেটে গেল কোনো উত্তর এল না। হঠাৎ একটা চিঠি এল। দাদা লিখেছে একমাসের চেষ্টায় একটা কাজ জোগাড় হয়েছে খনিতে। মাইনে বেশি কিন্তু জীবনের ঝুঁকি আছে। আমি যদি করতে চাই তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে হবে। ভাবলুম জীবনের ঝুঁকি নিশ্চয়ই এর থেকে বেশি কিছু হবে না—তবু সৎভাবে তো বাঁচতে পারব। সমাজের অপরাধীদের সঙ্গে তো নাম জড়িয়ে থাকবে না। দাদাকে লিখে দিলুম—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাচ্ছি। লিখে তো দিলুম কিন্তু ওদের ঐ শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে যাব কি করে! পালালে পার পাব না। তার চেয়ে কায়দা করে যদি বলা যায়—হয়তো বা তাতে কাজ হতে পারে। তবে আমার দৃঢ় ধারণা ছিল ঝরিয়ায় একবার পালিয়ে যেতে পারলে ওরা আর ধরতে পারবে না। একদিন মরিয়া হয়ে বললুম,

—আমার ক'দিনের জন্য ছুটি চাই।

—ছুটি? জয়নাল হোহো করে হাসল। বলল, কিসের ছুটি রে? জীবনের ছুটি? জেনে রাখ আমাদের ছুটি হয় মরে গেলে তার আগে কোনো ছুটি নেই। ওদের চোখগুলো শিকারী নেকড়ের মতো জ্বলছিল। পারলে আমায় ভস্ম করে দেয়। সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে নিজেকে ঠিক রাখা বড় শক্ত। তবু আমি অপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলুম। হাউমাউ করে কেঁদে উঠলুম। চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। বললুম, ছোট থেকে মা হারা আমি। মাসি আমাকে মানুষ করেছিল। মাসির বাড়ি বর্ধমানে। আজ সেই মাসি মরমর। খবর এসেছে। একবার শেষ দেখা দেখতে পাব না? হায় হায় এমন ভাগ্য করেছি রে! দু'হাত দিয়ে মাথা চাপড়ে বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলুম। আমি যে এত ভাল অভিনয় করতে পারি নিজেও জানতুম না। ওরা কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করেছে বলে মনে হল না। চুপ করে আমায় লক্ষ্য করতে লাগল। আমি কেঁদেই চলেছি। তারপর হঠাৎ জয়নালের পা জড়িয়ে ধরে বললুম, একবার আমাকে দেখতে যেতে দাও। বিশ্বাস করো।

—চুপ কর। বিশ্বাস—! আমরা আমাদের বাপকেও বিশ্বাস করি না। তবে শুনে রাখ আমাকে ঠকিয়ে কেউ পার পায়নি, পারেও না। তুই যেখানে যাবি আমরাও তোর পেছু পেছু যাব। তুই নরকে গেলেও, বুঝেছিস।

বস্ একবার বিশ্বাস করে দেখ।

জয়নাল আবার হাসল—পৈশাচিক হাসি। তারপর বলল—ঠিক আছে যা।

ভাবতে পারিনি এত সহজে ছাড়া পাব। মুক্তির আনন্দে একটু বুঝি অসাবধান হয়ে পড়েছিলুম। যেদিন যাব সেদিন বিকেলে জামাকাপড় গোছাবার সময় মনের আনন্দে শিস দিয়ে ফেলেছিলুম। বোকার মতো ঘরের জানলাগুলোও খুলে রেখেছিলুম। একতলায় ঘর। রাস্তা

থেকে দেখা যায়—শিস্ দেবার পর হুঁশ হল তাড়াতাড়ি জানলাগুলো বন্ধ করে দিলুম। আর লক্ষ্য করলুম আশেপাশে ওদের কোনো লোক আছে কিনা। কাউকে দেখতে পেলুম না। চোখমুখে দুঃখের ছাপটা ফুটিয়ে রাখা উচিত ছিল। যার মায়ের মতো মাসি মরমর তার কি শিস্ দিয়ে গান আসে! ওদের আমি তখনও চিনতে পারিনি। ওরা কিন্তু সমানে আমাকে লক্ষ্য করছিল আর জয়নালের কাছে রিপোর্ট করছিল। কাপড়-জামা গুছিয়ে বাড়ি থেকে বেরচ্ছি, দেখি, পাড়ার সেই ছেলে দুটো দাঁড়িয়ে।

বলল—কি যাচ্ছ?

বললাম—হ্যাঁ ভাই।

ওরা বলল—যাবার আগে একবার বসের সঙ্গে দেখা করে যাও। বস্ ডেকেছে, তুমি তো ওদিক দিয়েই যাবে।

এড়াতে পারলাম না। সত্যি তো স্টেশনে যেতে গেলে তো আমাকে ওদিক দিয়েই যেতে হবে।

তবু বললাম—ট্রেন ফেল করে যাব যে।

ওরা হাসল। বলল—বসের ক্ষমতা জান না? ট্রেন দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না বস্ বলবে। বুঝেছো?

হঠাৎ চুপচাপ। চন্দন বলল—কি হল বস্—চুপ করে গেলে কেন! মুণ্ডুটা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। জানলার ফাঁক দিয়ে পুব আকাশের লাল আভা জানিয়ে দিল, ভোর হচ্ছে। আজ আর চন্দনের ঘুম এল না। মনে হচ্ছিল পল্টু কি সত্যিই ঝরিয়া যেতে পেরেছিল! নাকি তার আগেই.....!

পরদিন অফিসে যেতেই হাবিলদার বলল, স্যার, মর্গ থেকে বলছে বস্তার মধ্যে লোকটার মুণ্ডুটা নেই। কিন্তু আমরা তো স্যার সবই পাঠিয়ে দিয়েছিলুম।

চন্দন চুপ করে রইল। হাবিলদার একটা সাদা খাম চন্দনের হাতে দিয়ে বলল—ওদের রিপোর্ট স্যার।

চন্দন রিপোর্ট পড়ল। বিরক্তিতে ওর ভ্রূ দুটো কুঁচকে গেল। বলল—ভারি লিখেছে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে ওকে টুকরো করা হয়েছে এ তো আমরা সকলেই বুঝতে পেরেছি। এখন দেখতে হবে কারা এমন কাজ করল। আর কেনই বা করল। হাবিলদার বলল, লোকাল লোকদের কাছে যা রিপোর্ট পেয়েছি তা হল লোকটা অসামাজিক লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করত। কাজটা যে কি ধরনের ছিল সেটা কেউ বলতে পারল না। তবে দিন-রাত্তিরই লোকটা বাইরে বাইরে কাটাত এটা ঠিক।

চন্দন মনে মনে বলল—বাকিটা আমি বলব আর একদিন পল্টু আসুক! তার পর।

রাত বারোটার পর পল্টুর মুণ্ডুটা দেখা যেতেই চন্দন বলল—পল্টু, পোস্টমর্টেম করার সময় ওরা তোমার মুণ্ডুটা পায়নি, সেটা রিপোর্ট করেছে। কিন্তু আমরা জানি ওটা বস্তার মধ্যেই ছিল

—ছিল স্যার। মর্গে বস্তা খোলার পর আমি ওদের চোখের আড়ালে মুণ্ডুটাকে সরিয়ে নিয়েছিলুম। আমার কাজ হয়ে গেলে আমি কথা দিচ্ছি আপনাদের ফেরৎ দিয়ে দেব।

চন্দন বলল—তারপর কি হল বল।

—কী আর বলব স্যার আমার দুঃখের কথা। দাদার চিঠিটা আমার পুড়িয়ে ফেলা উচিত ছিল। তা না করে আমি ওটা পকেটে রেখেছিলুম। ওরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে চলল। আমি নিঃশব্দে যাচ্ছি। কেননা—যদি চেঁচিয়ে লোক জড় করতে যাই ওখানেই ওরা আমাকে খুন করে দেবে। জয়নাল বসেছিল একটা চেয়ারে। চোখ টক্‌টক্ করছে লাল। চারপাশে ওর সাঙ্গোপাঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে যমদূতের মতো। আমি যেতেই জয়নাল কি যেন ইশারা করল। ওরা আমার ব্যাগ হাঁটকাল, পকেট সার্চ করল। আর তাতেই দাদার চিঠিটা হাতে পেল। যতদূর মনে হয় এই চিঠিটাই ওরা খুঁজছিল। চিঠিটা জয়নাল আমাদের পাড়ার ছেলেটাকে পড়তে বলল। ও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ল। সব ফাঁস হয়ে গেল। আমি বুঝলুম আমি আর বাঁচতে পারব না। জয়নাল দেওয়ালে ক্যালেন্ডার সরাতেই ইঁটের ফাঁকে লুকনো একটা ধারালো ভোজালি বেরিয়ে পড়ল। সেটাকে হাতে নিয়ে জয়নাল আমার চারদিক ঘুরল।—কাছে এসে আমার চিবুক ধরে ভেংচে বলল—আহারে! মাসির বড় অসুখ—তাই বেচারা বর্ধমান যাচ্ছে। মিথ্যেবাদী বেইমান—গলার স্বর পালটে জয়নাল চাপা আক্রোশে ফেটে পড়ল। বলল—চাকরি চাস তো আগে বলিসনি কেন—তোকে যমের দুয়ারে পাঠিয়ে দিতুম। তারপর আমার মুখ বেঁধে হাত পা বেঁধে সবাই মিলে নিয়ে গেল ঘরের পেছনে নির্জন প্রান্তরে জঞ্জাল ফেলার জায়গায়।

হঠাৎ চুপ। কাটামুণ্ডু চুপ করতেই চন্দনের খেয়াল হল রাত শেষ। আপশোস লাগছে চন্দনের, আর দশমিনিট সময় পেলে সবটা শোনা যেত—কিন্তু এখনও একটু বাকি রয়ে গেল। আরো একরাত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। অপরাধীদের নাম-ঠিকানাটা আজ রাতেই তাকে লিখে নিতে হবে। প্রমাণ চাই। প্রমাণটা কি দিতে পারবে পল্টু? দুশ্চিন্তায় কাটল সারা দিন। রাত্তিরে আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে চন্দন অপেক্ষা করতে লাগল। হাতের কাছে রেডি রাখল কাগজ-কলম। কিন্তু আজ এত দেরি করছে কেন পল্টু! উত্তেজনায় বিছানাতেও স্থির হয়ে বসতে পারছে না চন্দন। তবে কি মুণ্ডুটা কেউ পুড়িয়ে দিয়েছে! তাহলে তো তীরে এসে তরী ডুববে। সব চেষ্টা বৃথা যাবে চন্দনের। সেও এই নৃশংস খুনের কিনারা করতে পারবে না। রাত একটার সময় পল্টু দেখা দিল। বলল চন্দন, কি ব্যাপার- তুমি তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলে।

কাটামুণ্ডু বলল—স্যার, এবার আমার ডাক এসেছে। চলে যেতে হবে। আমরা কেউ সেই ওপরওলার নির্দেশ অমান্য করতে পারি না। যা বলার আমায় আজই বলতে হবে।

চন্দন বলল—কার নির্দেশের কথা বলছো?

কাটামুণ্ডু এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। বলল—আপনি লিখে নিন স্যার। ওদের আস্তানাটা হল—রেলওয়ে ব্রিজ ক্রশ করে একটু নীচে নেমে ফাঁকা জায়গায়। তার পরে মদনমোহন পাড়া। ভাঙা ইঁটের একতলা ঘরটা ছিল এক লাইনম্যানের। ক্রশিংস-এর কাছে। ওরা ওটাকে দখল করে আস্তানা বানিয়েছে। ওদের বিরাট চক্র। কলকাতা থেকে ওয়াগানে মাল আসে। খবর চলে যায়— কোন ওয়াগনে কি আছে। গভীর রাতে ওরা ওয়াগন ভেঙে জিনিস বার করে চারদিকে পাচার করে। আশেপাশের শহর থেকে বিদেশে পর্যন্ত চালান হয়।

আগামী কাল ওদের একটা অপারেশান। আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। জানি না সেটা বদলেছে কিনা। কিন্তু ওদের হাতেনাতে ধরার এমন সুযোগ আপনি পাবেন কালকে। কাল বিকেল চারটের সময় নয়নপুর স্টেশনে নামবে এক শেরোয়ানি পরা মুসলমান। মাঝবয়সী। লোকটার হাতে থাকবে একটা অ্যাটাচি—তাতে থাকবে দশ লাখ টাকার জাল নোট। অন্য হাতে থাকবে একটা লাল গোলাপ। জাল নোট তৈরি আর পাচার করাও ওদের ব্যবসা।

চন্দন অস্থির হয়ে বলে—প্রমাণ দাও, প্রমাণ।

—হ্যাঁ স্যার, বলছি। বাড়ির পিছনে নিয়ে ওরা যখন আমায় কুপিয়ে কাটছিল তখন গলাটা এক কোপে উড়িয়ে দিতেই আমার গলায় ছিল রুপোর চেন—তাতে 'P' লেখা একটা লকেট, সেটা ঐ জঞ্জালে পড়ে আছে ওদের খেয়াল নেই। গলাটা তো উড়িয়ে দিল, দেহটা তো ধড়ফড় করতে লাগল। তখনই ঐ হারটা ছিটকে পড়ল।

দ্বিতীয়ত, ওদের ঘরের মধ্যে দেখবেন একটা ক্যালেন্ডার টাঙানো আছে দেওয়ালের গায়ে। ওটা সরালেই দেখবেন একটা ভোজালি ইঁটের ভেতর লুকানো আছে। তাতে এখনও আমার রক্ত লেগে আছে। অনায়াসে প্রমাণ করতে পারবেন—ওটা আমার রক্ত। আর একটা কথা, আমার ঘরের কাঠের আলমারিতে দেখবেন ওদের দলের লোকেদের নাম আর পরিচয় লেখা আছে। আমার মনে হয়েছিল ঝরিয়া চলে যাবার পর কেউ যদি ও ঘরে ঢোকে আমার সন্ধানের জন্যে তবে সব জানতে পারবে কেন আমি পালিয়ে যাচ্ছি। স্যার আর আমার সময় নেই স্যার। আমার কথা আপনি ধৈর্য ধরে শুনেছেন এটাই আমার বড় শান্তি স্যার। আমি জানি আপনি ঠিক ওদের ধরতে পারবেন। আর একটা কথা স্যার—মুণ্ডুটা পেলে পুড়িয়ে দেবেন—নয়তো আমার মুক্তি হবে না।

সকাল বেলা অফিস যেতেই ছুটে এলো হাবিলদার। তার চোখমুখ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। বলল— স্যার, আমাদের থানার পেছন দিকে একটা কাটামুণ্ডু পড়ে আছে।

না-জানার ভান করে চন্দন বলল—সে কি! ওটা আবার এল কোথা থেকে?

—জানি না স্যার। তবে দেখে মনে হচ্ছে একদম টাটকা নয়। দু-একদিনের পুরনো হতে পারে।

চন্দন একটু ভাববার ভান করে বলল—শোন ক'দিন আগে যে বস্তুটা আমরা পেয়েছিলুম নয়নপুরের বাজারের পাশ থেকে, সেটা মর্গে পাঠানো হয়েছিল, মনে আছে?

হাবিলদার মাথা নেড়ে বলল—মনে আছে স্যার, আর এটাও মনে আছে মর্গ থেকে খবর পাঠিয়েছিল ওরা কাটামুণ্ডুটা পায়নি, তাই না স্যার?

—ঠিক তাই। চন্দন খুশি হয়ে তাকাল হাবিলদারের দিকে। তুমি যে কোনো অফিসারের থেকেও ভাল কাজ কর। খুব কর্তব্যপরায়ণ তুমি, শিগ্গিরই অফিসার হয়ে যাবে হাবিলদার।

—কি যে বলেন স্যার! কিন্তু স্যার আমি কিন্তু শেষ মুহূর্তেও দেখেছি মুণ্ডুটা ছিল।

—শোন হে! এ সব তর্কাতর্কির ব্যাপার নয়। ওরা রিপোর্ট করেছে মুণ্ডুটা থলেতে ছিল না। এবার যদি জানা যায় যে ওটা থানাতেই পড়ে আছে তাহলে কিন্তু আমাদের কাজে গাফিলতির অভিযোগে দুজনেরই চাকরি যাবে—নয় বদলির হুকুম এসে যাবে।

—কিন্তু স্যার...

—জানি। ওকে থামিয়ে দিয়ে চন্দন বলল—এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যে। কিন্তু সেটা প্রমাণ হবে না। তারচেয়ে একটা কাজ কর। সবার চোখ এড়িয়ে ওটাকে চটে মুড়ে ফেল। তারপর চলে যাও সোজা জঙ্গলে। কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে এস। কোনো প্রমাণ রাখবে না আর কোনো সাক্ষীও থাকবে না। হ্যাঁ, আর একটা কথা—দুজন কনস্টবল নিয়ে আজ বিকেল ঠিক চারটের সময় আমি ছদ্মবেশে থাকবো স্টেশনে। কনস্টেবলরা কুলিমজুরদের পোশাকে থাকবে। একটা গ্যাঙ্কে ধরবার সুযোগ আছে। তোমাকে দায়িত্ব দিলুম তুমি সব ব্যবস্থা করে রেখো। মনে রেখো পুলিশি গাড়ি, পোশাক কিছু চলবে না।

—ঠিক আছে স্যার।

ঠিক চারটের সময় নয়নপুর স্টেশনে দেখা গেল ছেঁড়া জামাকাপড় পরা এক খোঁড়া ভিখিরি ভিক্ষে চাইছে। চারটে নাগাদ ট্রেন এলো। ভিড় কম—এক ভদ্রলোক নামলেন শেরোয়ানি পরে। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, সরু গোঁফ—বেশ শৌখিন সাজ। এক হাতে সাদা গোলাপ অন্য হাতে অ্যাটাচিটা। ভিখিরিটা ওকে দেখেই দুটি কুলি দাঁড়িয়ে ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে ইশারা করল। প্রথমে দুটো কুলি চলে গেল। ভিখিরিটা কিন্তু ঐখানে ঘুরঘুর করতে লাগল আর ভিক্ষে চাইতে লাগল। দুটো লোক এগিয়ে এলো। শেরোয়ানি পরা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল চলুন স্যার—সামনে পথ।

ওরা চলতে শুরু করল ভিখিরিবেশী চন্দন দুটো কুলিকে নিয়ে ওদের অনুসরণ করল। ওরা সেই ইট বার করা বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই চন্দনের কথামতো দু'লরি পুলিশ বাড়িটা ঘিরে ফেলল। চারদিকে জনতার ভিড় জমে গেল। চন্দন দরজায় টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। দুজন অফিসার কুলির পোশাক পরে আর চন্দন ভিখিরির পোশাকে হড়বড় করে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। ওখানে প্রায় দশ বারোজন ছিল। চন্দন চেঁচিয়ে উঠল—অ্যারেস্ট দেম—।

বাইরে থেকে দলে দলে পুলিশ ছুটে এলো। জয়নালের দল হতভম্ব। এক পাও নড়তে পারল না। পল্টুর বিবরণ অনুযায়ী মধ্যিখানে চেয়ারে বসা লোকটাকে গিয়ে বলল চন্দন—জয়নাল? তাই না!

লোকটা উত্তর দিল না, কিন্তু ততক্ষণে সবার হাতে হাতকড়ি পড়ে গেছে। চন্দন নিজে এগিয়ে গিয়ে দেওয়াল থেকে ক্যালেন্ডারটা সরাল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো ধারালো একটা ভোজালি। পল্টনের কথা ঠিক। ভোজালিটায় এখনও রক্তের দাগ। ভোজালিটা খুব সাবধানে বড় রুমাল দিয়ে ধরল চন্দন। তারপর বলল—বাড়ির পেছনে চল—জঞ্জাল ফেলার জায়গায়। পেছনে যেতেই দেখা গেল আবর্জনাগুলোর ওপর চাপ চাপ রক্ত। একটা বড় কাঠি দিয়ে জঞ্জালগুলো নাড়াচাড়া করতেই 'পি' লকেট দেওয়া রুপোর চেনটা বেরিয়ে এলো। সেটাও খুব সাবধানে নিয়ে নিল চন্দন। কোর্টে এসব দেখাতে হবে তো।

একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল পুলিশের ভ্যান। দলবেঁধে সবাইকে ভ্যানে তোলা হল। অ্যাটাচিটা চন্দন নিয়ে গেল আর একটা প্রমাণ হিসেবে। অফিসে গিয়ে সকলের সামনে অ্যাটাচি খোলা হল। দেখা গেল—পাঁচশো টাকার জাল নোটে স্যুটকেসটা ভর্তি। সব দেখে চন্দনের মুখে হাসি ফুটল। নিজের মনেই ও বলে ওঠে—পল্টু, তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ। তোমার জন্যেই আজ আমি কুখ্যাত দলটাকে ধরতে পারলুম। বহুদিন ধরে পুলিশ এদের খুঁজছিল—ইন্টারন্যাশনাল স্মাগলার।

কিন্তু চন্দনকে একটু চিন্তিত দেখাল। কুলি সাজা দুজন অফিসারকে ডেকে বলল—চোরাই মালগুলো তো একটাও ঘরে দেখলুম না।

ওরা উত্তর দিল—এক মিনিট স্যার; আমরা আপনার কাছেই আসছিলুম।

ওরা চেঁচিয়ে ডাকল—বরুণবাবু—

বরুণবাবু ওরফে চন্দনের ডান হাত—প্রথম অফিসার একটা অ্যাটাচি এনে চন্দনের সামনে রাখল। বলল—স্যার, এই টাকার বদলে ওরা এটা পাচার করছিল।

সকলের সামনে চন্দন বাক্সটা খুলল তালা ভেঙে। দেখল তার মধ্যে রয়েছে দামীদামী রত্ন—আর কিছু সোনার বার। চন্দন ওদের দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলল—থ্যাঙ্ক ইউ। আপনারা দারুণ কাজ করেছেন। থ্যাঙ্ক ইউ এগেন।

চলমান ঘটনা

মনোজ বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। বাবা সুখময় সান্যাল ব্যাঙ্কের এক সাধারণ কর্মচারী। অনেক কষ্ট আর ত্যাগ স্বীকার করে তিনি তাঁর একমাত্র ছেলে মনোজকে মানুষ করেছিলেন। মনোজ ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ভাল চাকরি পেয়েছে। সুখময়-বাবু বুড়ো বয়সে একটু সুখের মুখ দেখেছেন। মনোজের মতো এমন পিতৃমাতৃভক্ত ছেলে পেয়েছেন—এ তাঁর সৌভাগ্য। আর মনোজ সব সময় মনে করে তার বাবা-মা কত কষ্ট করেছেন তার জন্যে। আজ যে সে বড় হয়েছে সে তো তাঁদেরই জন্যে। এইসব ভেবে মনোজ ঠিক করল বাবা-মায়ের জন্যে একটা গাড়ি কিনবে। প্রথমে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কিনবে। নিজে গাড়ি চালানো শিখবে। চালানো শিখে নতুন গাড়ি কিনবে। আপাতত তাকে একজন ড্রাইভার রাখতে হবে গাড়ি কিনলে। কিন্তু পুরনো গাড়ির সন্ধান দেবে কে? অফিসের বন্ধুরা বুদ্ধি দেয়—ক্রয়-বিক্রয় কলমে একটা পুরনো গাড়ি চাই বলে বিজ্ঞাপন দিলেই হবে আর তার সঙ্গে কর্মখালি কলমে একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাইও দিয়ে দিলে সব ব্যাপারটাই সমাধান হয়ে যাবে। মনোজ তাই করল। রবিবারে খবরের কাগজে তার বাড়ির ঠিকানা দিয়ে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েও গেল। সবে কাগজটা হাতে পেয়ে নিজের বিজ্ঞাপনটা খুঁজছে এমন সময় কলিং বেলের আওয়াজ।

মনোজ চায়ের কাপটা টেবিলে নামিয়ে দরজা খুলল। দেখল, একজন অচেনা মানুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে। মাথার চুল সব সাদা, চোখ দুটো একটু বসা। বয়সটা মনে হয় ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। কিন্তু চোখের দৃষ্টিটা যেন বড় বেশি তীক্ষ্ণ। মনোজ লোকটিকে জিগ্যেস করে—কাকে চাই? লোকটি বলল, আজকের কাগজে দেখলাম একজন অভিজ্ঞ ড্রাইভার চেয়েছেন আপনারা, তাই দেখা করতে এলাম।

—ও আপনি ড্রাইভার হিসেবে এসেছেন? কিন্তু আপনার তো যথেষ্ট বয়স হয়েছে। মনোজ বলে।

—হতে পারে। কিন্তু আজও আমি যথেষ্ট শক্ত আছি। আমার চল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা আছে, আমার দৃষ্টি খুব প্রখর—চশমা নিতে হয় না। এবার বলুন, আপনি কি আমাকে যোগ্য বলে মনে করছেন না!

একটু বিব্রত হয়ে মনোজ বলে, আপনি ভেতরে আসুন, ব্যাপারটা আপনাকে একটু খুলে বলা দরকার।

মনোজ ভদ্রলোককে ভেতরে এনে বসাল। দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল—আসলে আজকের কাগজে আমি দুটো বিজ্ঞাপনই দিয়েছি। এক নম্বর ড্রাইভার চাই—আর দু'নম্বর হল একটা ভাল কনডিশানের সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি চাই। এখন বুঝতে পারছি আমি ভুল করেছি। আমার উচিত ছিল গাড়ি কিনে তারপর ড্রাইভারের জন্য বলা। অবশ্য আমি যে এটা একেবারে ভাবিনি তাও নয়। ব্যাপারটা হল, আমি নিজে তো গাড়ি চালাতে জানি না। সুতরাং গাড়ি কিনলে চালিয়ে আনবেটা কে?

ভদ্রলোক মনোজের কথায় হাসলেন। বললেন—আমি কিন্তু কাগজে আপনার গাড়ির ব্যাপারটাও দেখেছি।

মনোজ বলল, দেখেছেন তো! তাই বলছি, আপনি বরং আপনার নাম-ঠিকানা দিয়ে যান, গাড়ি কিনেই আমি আপনাকে খবর দেব।

ভদ্রলোক বললেন—আর যদি আমি আপনাকে গাড়ির সন্ধান দিই, আপনি একবার দেখতে যেতে পারবেন কি?

মনোজ অবাক হল। লোকটি তো খুব করিৎকর্মা, নিজের চাকরির জন্যে সব ব্যবস্থা করে তবে এসেছে। মনোজ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না, টেবিলের ওপর থেকে একটা কাগজ আর কলম হাতে তুলে নিয়ে বলল—বলুন, আপনার নাম-ঠিকানা।

—আমার নাম রতন পাণ্ডা। ঠিকানা উনিশ নম্বর মনোতোষ পাল স্ট্রীট। কলকাতা সাত লক্ষ ছয়।

মনোজ হেসে বলল—আপনি তাহলে আমাদের মতো উত্তর কলকাতার লোক। ভাল, ভাল, খুব ভাল, মনোতোষ পাল লেন তো আমার বাড়ি থেকে মাত্র দশমিনিটের পথ—হেঁটে গেলে, তাই না! মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। বললেন—ঠিক বলেছেন। মনোজ বলল, এবার বলুন তো গাড়ির কথা কি বলছিলেন?

একটু চুপ করে থেকে ভদ্রলোক বললেন—গাড়িটা আমার আগের মনিবের। কিন্তু

মনিব মারা যান ঐ গাড়ির ভেতর—তারপর থেকে আমিও বেকার আর গাড়িটাও পড়ে আছে।

মনোজ বলল—ব্যাপারটা বুঝলাম না। আপনি কি করে ও গাড়ি বিক্রি করার কথা ভাবছেন! এ তো মালিকের সম্পত্তি। তাঁর অবর্তমানে তাঁর উত্তরাধিকারীরা পাবেন। আপনি এখানে.....

মনোজকে থামিয়ে দিয়ে রতন বললেন—স্যার—আমার ঐ গাড়িটার ওপর কতটা অধিকার আছে সেটা বলতে গেলে একটা গল্প বলতে হয়। যদি অবশ্য আপনার শোনার ইচ্ছে থাকে।

মনোজ বলল—তার আগে বলুন তো গাড়িটা কি গাড়ি, কন্ডিশান কেমন?

রতন পাণ্ডা বললেন, গাড়ি একেবারে নতুন। বাবু মাত্র ক'টা মাস ব্যবহার করেছেন। অ্যামবাসাডার, একেবারে নতুন মডেল। এরকম গাড়ি স্যার, আপনি বাইরে পাবেন না এ আমি হলপ করে বলতে পারি। তাছাড়া এ গাড়ি আর আমি যদি একসঙ্গে থাকি আপনার কাছে তাহলে আপনার লাভই হবে, স্যার।

—কিরকম?

—সেটা শুনতে গেলে তো আমার গল্পটা আপনাকে শুনতে হবে, স্যার।

—বেশ বলুন। গল্প শুনলে যদি আমার লাভ হয় তো আমি শুনতে রাজি আছি।

রতন পাণ্ডা বলতে শুরু করলেন—

—মনোতোষ পাল স্ট্রীটের লাহাদের বাড়িতে আমার বাবা ছিলেন হিসাব রক্ষক। খুব অল্পবয়সে আমার মা মারা যান। আমি আর আমার বাবাকে থাকবার জন্যে তাঁর বাড়িতে একটা ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন জ্যোতিপ্রকাশ লাহা। তারপর হঠাৎ বাবাও একদিন মারা গেলেন। তখন আমার বয়স পনেরো। জ্যোতিপ্রকাশবাবুকে আমরা কর্তাবাবু বলতাম। উনি একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার তখন নিজেকে মনে হচ্ছিল স্রোতে ভেসে যাওয়া যেন একখণ্ড খড়। কর্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম ভয়ে ভয়ে। ভাবলাম, এবার এ আস্তানাটাও যদি যায় তাহলে কোথায় যাব। আমার তো কেউ কোথাও নেই। কর্তাবাবু তখন ঘরে ছিলেন। বসেছিলেন ফরাসের ওপর, হাতে ছিল গড়গড়ার নল। তিনি হাত নেড়ে ইশারা করে বসতে বললেন। বসলাম। বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে হল। তারপর উনি বললেন—ভয় পেয়েছো? মনে করছো আমি তাড়িয়ে দেব? না—তা করবো না। তোমার বাবা সারাজীবন আমাদের জন্যে কাজ করে গেল। তুমি তার ছেলে, তোমাকেও আমি আমার কাছে বহাল করে নেব। তবে এখন নয়, লেখাপড়া শেষ করার পর। আমার স্বপন যেমন পড়ছে তুমিও তেমনি পড়। পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমায় কাজ করতে হবে না। তোমার সব খরচ আমার।

জানি না মায়ের স্নেহ কাকে বলে—তবে বাবুর চোখে সেদিন যে মায়ামমতা আর

স্নেহ দেখেছিলাম তা আমি আজও ভুলতে পারিনি। আমার চোখে জল এসে গেল। আমি কর্তাবাবুকে প্রণাম করে ঘরে গেলাম।

একটু অস্বস্তি বোধ করছে মনোজ। লোকটা গাড়ির কথা বলব বলে যে স্মৃতিকথা বলতে শুরু করল।

আশ্চর্য! রতন ঠিক ধরতে পেরে গেলেন মনোজের মনের কথা। কি করে বুঝলেন অবাক লাগল মনোজের। রতন বললেন—বিশ্বাস করুন স্মৃতিচারণ নয়। বললে আপনি বুঝতে পারবেন গাড়ি ব্যাপারে এসব বলা খুবই দরকার। মনোজ চুপ করে যায়। রতন আবার বলতে শুরু করেন—আমার আর স্বপনদাদাবাবুর এক বয়স। আমাদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্বও হয়ে গিয়েছিল—যদিও আমি সব সময় মনে রাখতাম ও আমার মনিব। একদিন কর্তাবাবু ডেকে বললেন—শোন রতন, মাস দুয়েকের মধ্যে গাড়ি চালানো শিখে লাইসেন্স করে নাও। স্বপনের ইচ্ছে আমি একটা গাড়ি কিনি। একমাসের মধ্যে নতুন ঝকঝকে সাদা ঘোড়ার মতো অ্যামবাসাডার কেনা হল। ওঃ, সেদিন স্বপনদাদাবাবুর কি আনন্দ! আমায় ডেকে বলল—চল রতন। আমাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসবি চল। আমি তখন গাড়ি চালাতে শিখেছি বটে কিন্তু লাইসেন্সটা হয়নি। একটু ভয়ে ভয়ে বললাম—কিন্তু এখনো যে লাইসেন্স হয়নি।

আরে তাতে কী! ও তো হয়ে যাবে ক'দিন বাদে কিন্তু তখন এই প্রথম দেখার আর ঘোরার আনন্দটা থাকবে? তুইই বল।

বললাম—বেশ চল। কিন্তু কর্তাবাবু যদি.....

আমায় থামিয়ে দিয়ে দাদাবাবু বলে—সে আমার দায়িত্ব, তুই চল।

মনোজ বাধা দিয়ে বলল—কিন্তু বয়সটা.....

একগাল হেসে রতন বললেন—এই দেখুন, কথায় কথায় ভুল হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে পাঁচ বছর কেটে গিয়েছিল--তখন আমার বয়স ছিল কুড়ি। কিন্তু দুঃখের কথা, গাড়ি কেনার দিন সাতেক পরেই কর্তাবাবু মারা গেলেন। আমি স্বপনদাদাবাবুর ড্রাইভার হয়ে লাহাবাড়িতে জীবন কাটাতে লাগলাম। এরপর একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। বছর খানেক পরে স্বপনদাদাবাবুর বিয়ে হল। সে কি ঘটা করে বিয়ে! সাদা অ্যামবাসাডারে করেই বর গেল। কে বলবে গাড়ি, যেন একটা বিরাট রাজহংস যাচ্ছে। ঠিক ছ'মাস যেতে না যেতেই একটা কঠিন অসুখে দাদাবাবুর নতুন বৌ মন্দিরা বৌদি মারা গেলেন। দাদাবাবু আর বিয়ে করল না। কত করে সব আত্মীয়স্বজন বোঝালেন বিয়ে না করলে বংশধর আসবে কি করে? সব যে শেষ হয়ে যাবে। দাদাবাবুর ঐ এক কথা—একদিন না একদিন তো সব শেষ হবেই—এ আর নতুন কথা কি? আগেকার দিনের রাজারাজড়ারা ঘোড়ায় চড়ে শখ মেটাতেন। আমাদের দাদাবাবু রাতদিন ঘুরে বেড়ায় সাদা অ্যামবাসাডারে। একটা নেশার মতো মনে হয়েছিল আমার। কিছু বললে বলত--গাড়িটা আমার প্রাণ রে। এ গাড়ি না চড়ে আমি থাকতে পারব না। আমি হয়তো মরবার পরও গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়াব বুঝলি।

মনোজ বলল, সে আবার হয় নাকি?

রতন হেসে বললেন—আরে সত্যি নাকি—ও তো ঠাট্টা করে এসব বলেছে। কিন্তু যত্ন কাকে বলে দেখতে হয়। গাড়ির যদি এতটুকু কোথাও অসুবিধে দেখা দিয়েছে তো আর দেখতে হবে না—সেরা মিস্ত্রি দিয়ে বহু টাকা খরচ করে সেটাকে সারিয়ে নেয়। এখান থেকে দমদম বা জয়রামবাটি অথবা বর্ধমান, আসানসোল, জসিডি দেওঘর—যেখানে যেতে ইচ্ছে হত বলত—চল রতন, বেরিয়ে পড়ি। আসলে ছেলেপিলে, ঘর-সংসার কিছু তো হল না। সব ভালোবাসা গিয়ে পড়ল গাড়িটার ওপর।

একদিন দাদাবাবুর খুব জ্বর হল। ডাক্তার বলল—বাইরের হাওয়া লাগালে চলবে না। একদম রেস্টে থাকতে হবে। দুটো নাকই সর্দিতে ভরে গেছে। আমাকে ডেকে পাঠিয়ে দাদাবাবু বলল—গাড়ি বার কর, আমি বেরব। মা গঙ্গাকে একবার দেখে আসি চল। খুব রাগলাম। বললাম, কিছুতেই না। আজ আমি বেরব না। তুমি অসুস্থ।

রাগ করে দাদাবাবু বলল—বেশ, তুই না যাস আমি নিজেই যাব। নিজেই চালাব।

আমি জানি ওর হাত এখনও তৈরি হয়নি। অগত্যা নিমরাজি হয়ে বললাম। বেশ, চল যাচ্ছি।

বেরিয়ে পড়লাম নীল আকাশের নীচে। অন্যদিন দাদাবাবু সামনে বসে, আজ পেছনে একটা বালিশ দিয়ে শুলো। কয়েকবার কথা বলতে গেলাম। হুঁ-হাঁ করছে দেখে চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগলাম। গঙ্গার ধারে গিয়ে গাড়ি রেখেছি। প্রিন্সেপ ঘাটের ধারে দেখি দাদাবাবু ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি খুব ধীরে ধীরে ডাকলাম। উঠলো না। তারপর পেছনের দরজা খুলে হাতের ওপর হাতটা দিয়ে নাড়া দিতেই হাতটা লুটিয়ে পড়ল। পরীক্ষা করে দেখলাম। দাদাবাবু নেই বলে মনে হল। ভাবলাম শেষ চেষ্টা করে দেখি।

সারকুলার রেল আসছে লেভেল ক্রশিং বন্ধ রেখেছে। আমার কোনো জ্ঞান ছিল না, আমি ক্রশিংয়ের তলা দিয়ে গিয়ে গঙ্গার জল নিয়ে এলুম আঁজলা করে। ফেরার সময় দেখলাম সামনেই ট্রেন। কিন্তু দেখার সময় আমার ছিল না। আমি তখন পাগল হয়ে গেছি ভয়ে। জল এনে দাদাবাবুর মুখ-চোখে দিলাম। কিন্তু সব ব্যর্থ।

দাদাবাবুর কেউ কোথাও ছিল না। দূরসম্পর্কের এক মামা ছিলেন। তিনি বাড়ির দখল নিলেন। কিন্তু যেমুহূর্তে শুনলেন গাড়ির ভেতর দাদাবাবুর মৃত্যু হয়েছে তখুনি বললেন—রতনবাবু, আপনি গাড়িটা নেবেন তো নিন—আমরা আর ওটায় চড়বো না। আর একটা কথা—গাড়ি নিয়ে এবার আপনিও বিদায় হোন। শুনেছিলাম ওরা নাকি আমাকেও ভূত মনে করেছিল। কিন্তু এখন বলুন—গাড়ি-আমি দুজনেই আশ্রয়হীন, আপনি যদি আশ্রয় দেন আমি সবসুদ্ধ এখানে এসে থাকতে পারি। গাড়ির জন্যে আপনার কোনো টাকা দিতে হবে না। শুধু পেট্রল খরচ আর গাড়ি সারাবার খরচ আপনার।

এবার বুঝতে পারছেন কেন একথা আমাকে বলতে হল। প্রথমে এসেই যদি বলতাম

গাড়ির জন্যে আপনার পয়সা লাগবে না—আপনি কি মানতে পারতেন? সত্যি কথা বলুন।

মনোজ বলল—আমার এখানে থাকার অসুবিধে নেই। বাড়িটা আমরা কিনেছি—কিন্তু এর একটা বড় সুবিধে হল—গ্যারেজ আছে দুটো বড়। আর গ্যারেজের মাথার ওপর রয়েছে একটা গেস্টরুম। ছোট। ওটাই আপনার জন্যে ব্যবস্থা করতে পারি। কিন্তু গাড়িটার কনডিশান কিরকম সেটাই তো জানা হল না।

—জানবার দরকার নেই স্যার। ও গাড়ি আমার হাতে। আমি চালাব। সুতরাং সব দায়িত্ব আমার।

সত্যি বলতে কি মনোজ খুশিই হল। একে তো গাড়ি সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। দ্বিতীয়ত, গাড়িটার জন্যে এক পয়সা কেনার খরচ পর্যন্ত নেই। আবার রতনের মতো একজন এক্সপার্ট ড্রাইভার দায়িত্বে থাকলে তো খুব ভাল হয়।

তবু একবার বাজিয়ে নিল মনোজ। বলল—কিন্তু আপনাকে কত দিতে হবে বললেন না তো।

রতন বললেন—কিছু না স্যার। শুধু দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিলেই হবে। আমার কোনো নেশা নেই, আর চাহিদাও নেই।

মনোজ একটা কথা জিগ্যেস না করে থাকতে পারে না। বলল—আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না গাড়িটা বিক্রি না করে আপনি এটাকে নিয়ে এভাবে.....।

রতন বললেন—এ গাড়ি আমি বিক্রি করতে পারি না স্যার। এ গাড়ির সঙ্গে আমার দাদাবাবুর আর আমার আত্মা জড়িয়ে গেছে—একে কখনো বিক্রি করা যায়!

কথাটা কানে লাগলেও মাথা ঘামাল না মনোজ।

বিকেলেই গাড়ি এসে গেল। চোখ জুড়িয়ে গেল সকলের। মনোজ ভাবল এ তার বাবা-মায়ের আশীর্বাদ, নয় তো এও কি সম্ভব! ঠিক করল—সবাই বিকেলে বেড়াতে যাবে। তার আগে....আবার মনের কথা জেনে রতন বলে উঠলেন—হ্যাঁ, তার আগে পেট্রল, মোবিল, চাকার হাওয়া, ব্রেকওয়েল সব ঠিক করে নিতে হবে। মনোজ বলল—ঠিক আছে, আপনি অপেক্ষা করুন আমি আসছি।

মনোজ চলে যেতেই রতন একটা কাণ্ড করলেন।

গাড়ির গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন—দাদাবাবু, তোমার অশান্ত আত্মা এবার শান্তি পাবে। কত ঘুরবে ঘোর না। কেমন ব্যবস্থা করলুম বল।

গাড়ি মধ্যে থেকে কে যেন বলে ওঠে—সাবধান রতন। কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড় না কিন্তু। ওরা যদি বুঝতে পারে ব্যাপারটা, ওরা কিন্তু গাড়ি বিক্রি করে দেবে। আর সেখানে তোমার জায়গা নাও হতে পারে।

রতন একটু চুপ করে থেকে বললেন—আমি কথাটা মনে রাখব।

বিকেল বেলা গাড়ি একেবারে ঠিক করে মনোজ গাড়ি নিয়ে বাড়ি এল। ছুটতে ছুটতে ওপরে গিয়ে মা বাবাকে তাড়া দিতে লাগল। সুখময়বাবু পেনশনের কাগজগুলো ঠিক করে রাখছিলেন আর মা মৃন্ময়ী দেবী চায়ের জোগাড় করছিলেন। মনোজ ঘরে

ঢুকে বলে ওঠে—মা, আজ চা আমরা বাইরে খাব।—আর বাবা, কাগজ গোছাও—জামাকাপড় পরে তৈরি হও। নীচে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চল—শিগ্গির চল।

—গাড়ি? অবাক হন সুখময়বাবু—বলেছিলি গাড়ি, ড্রাইভার সব করব। এর মধ্যে সব হয়ে গেল? হ্যাঁ?

হ্যাঁ, চল না—কথা না বলে দেখবে চল।

ওঁরা নীচে এসে গাড়ি দেখে হাঁ হয়ে গেলেন।

—একি রে, তুই কত খরচ করেছিস রে? নতুন গাড়ি কেনার মতো এত টাকা কি আমাদের হয়েছে?

বাবার কথায় রাগ করল না মনোজ বলল—ইনি হলেন রতন পাণ্ডা, এই গাড়ির মালিকের ড্রাইভার। মালিক মারা যাবার সময় গাড়িটা ওনাকেই দিয়ে যান। আর আজ থেকে উনি আর ওঁর গাড়ি থাকবে আমাদের বাড়িতেই।

—কিন্তু পয়সা না দিয়ে.....।

মৃন্ময়ী দেবীর কথাটা ধরতে মনোজের দেরি হল না। ও বলল—হ্যাঁ, সে তো বটেই। টাকাপয়সা না দিয়ে কিছু হয়। আমাদের গাড়ির সব খরচ ছাড়া ওনার খাওয়া-পরার দায়িত্বও আমার। তার বিনিময়ে আমরা গাড়ি আর ড্রাইভার পাচ্ছি চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে। কি ভাল না!

সুখময়বাবু আর মৃন্ময়ী দেবী পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে গাড়িতে উঠে পড়লেন। বাবা-মাকে পেছনের সিটে বসিয়ে মনোজ সামনের দরজা খুলে উঠতে গেল। বাধা দিলেন রতন। প্রায় হাঁ হাঁ করে বলে ওঠেন—স্যার—পেছনে বসুন না স্যার, সামনে গরম লাগবে। রতনের কথা না শুনে সামনে উঠে বসে মনোজ একটু গম্ভীর স্বরে বলে ওঠে—আমি সামনেই বসব। এত জায়গা থাকতে পেছনে ভিড় বাড়াব কেন!

রতন যেন একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন। সেটা লক্ষ্য করে মনোজ বলে ওঠে—কি ব্যাপার? আপনি কি চান আমি পেছনে বসি।

রতন হঠাৎ বলে ফেলেন—হ্যাঁ স্যার। তাহলে ভাল হয়।

মনোজ সোজাসুজি ঘুরে দাঁড়ায়—কেন বলুন তো? এতে কি সুবিধে?

—না—মানে.....না.....আমতা আমতা করতে থাকেন রতন। মনোজ রেগে গিয়ে বলে ওঠে—আমি বুঝতে পারছি না এতে আপনার অসুবিধেটা কোথায় বলুন তো।

রতন বললেন—না না স্যার, আমার জন্যে বলছি না। আর কোনো কথা না বাড়িয়ে রতন বললেন—চলুন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে ময়দানে যাব। রতন আর কিছু না বলে কি বোর্ডে চাবিটা লাগিয়ে দিলেন। মনোজ অদ্ভুত অদ্ভুত সব ব্যাপার লক্ষ্য করতে লাগল, চাবিটা আপনা আপনি ঘুরে গিয়ে স্টার্ট হল। স্টিয়ারিং ধরে বসে রইলেন রতন। অথচ মনোজ পরিষ্কার দেখছে—গিয়ার, এক্সেলেটর, ব্রেক, সব কিছু আপনা আপনি হয়ে যাচ্ছে। কি বলতে যাচ্ছিল মনোজ, হঠাৎ অনুভব করল তার পাশে কেউ বসে আছে। তাকে চোখে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার নিশ্বাস ওর

গায়ে লাগছে—আর কিরকম যেন একটা হিমশীতল ভাব। এই গরমের মধ্যে কেমন যেন একটা ঠান্ডা স্পর্শ। মনোজের সারা শরীর ঝিমঝিম করে উঠল! রতনের দিকে তাকিয়ে দেখল লোকটা যেন পাথর হয়ে বসে আছে। খানিকক্ষণ পরে মনোজ আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল। আর সেটা বুঝতে পারার পরই মনোজের খুব ভয় ভয় করতে লাগল। আসলে গাড়ি তো চলছে—কিন্তু রাস্তা দিয়ে তো নয়। হাওয়ায় উড়ছে যেন।

মনোজ খুব আস্তে করে ডাকল—'রতনবাবু!' কোনো সাড়া নেই, যেন রতন অন্য জগতে চলে গেছেন। গাড়িটা কিন্তু ঠিক এসে দাঁড়াল ময়দানে। সুখময়বাবু, মৃন্ময়ী দেবীও বোধহয় কিছু আন্দাজ করছিলেন। ওঁরা একদম চুপচাপ বসেছিলেন। গাড়ি থামতেই রতন আবার স্বাভাবিক। বললেন—আপনারা ঘুরে আসুন, গাড়ি এখানেই থাকবে।

মনোজ বাবার দিকে তাকিয়ে বলল—বাবা, মাকে নিয়ে একটু এগোও আমি আসছি।

ওরা এগিয়ে যেতে জিগেস করল মনোজ, আচ্ছা রতনবাবু, আপনি গাড়ি চালাচ্ছিলেন, না অন্য কেউ?

রতন চমকে উঠলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে ওঠেন—এ কি বলছেন স্যার—! আমি যে গাড়ি চালাচ্ছিলাম সে তো আপনি দেখছিলেন, স্যার। এখানে তৃতীয় ব্যক্তি আসে কি করে?

মনোজ বুঝতে পারে এখানে বলে আর কিছু লাভ নেই—তবে একটা রহস্য আছে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। বেড়ানোর আনন্দটাই মাটি হয়ে গেল ওদের। একটা অস্বস্তি সবসময় তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে রেখে দিল। ফেরার সময় আবার ঠিক সেই এক ব্যাপার। হাওয়ায় উড়ে এল গাড়িটা। মাত্র পনেরো মিনিটে ময়দান থেকে বাড়ি। এ কি করে হয়! মনোজ আবার বলে উঠল, এত তাড়াতাড়ি কি করে এলাম বলুন তো!

রতন খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন—কেন? আমি তো ঠিক স্পিডেই গাড়ি চালিয়েছি।

নাঃ, তর্ক করে লাভ নেই। মনোজ ঠিক করল, লুকিয়ে লুকিয়ে সে রতনের কাজকর্ম লক্ষ্য রাখবে। ভূত সে বিশ্বাস করে না কিন্তু সবটাই যেন কেমন ভূতুড়ে বলে মনে হচ্ছে তার। দু-একদিন পর হঠাৎ মাঝরাত্তিরে আচমকা ঘুমটা ভেঙে গেল মনোজের। চারদিক নিস্তব্ধ বলেই বোধহয় মনে হচ্ছে কারা যেন চাপা গলায় কথা বলছে। ঐ একটা জিনিসে মনোজের বড় ভয়—তা হল চোর-ডাকাত। প্রথমেই তার মনে হল তাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। তারপর অন্ধকারেই ঘরের দরজা খুলে বেরতেই লক্ষ্য পড়ল গ্যারেজের আলোর একটা আভা যেন তাদের বারান্দায় পড়েছে। পা টিপে চুপি চুপি সে এগিয়ে যায় গ্যারেজের দিকে, হাঁ, এই দৃশ্যটার জন্যেই সে অপেক্ষা করছে। গ্যারেজে আলো জ্বলছে। রতন একটা টুল পেতে গাড়ির ডানদিকে ড্রাইভারের সিটের দিকটায় বসে আছে। সামনের দরজাটা খোলা। মনোজ উঁকি মেরে দেখল গাড়িতে কেউ নেই। কিন্তু রতন কারো সঙ্গে বসে গল্প করছে। তবে কি রতন পাগল? তা

কি করে হয়—সে তো আজ সবটাই নিজের চোখে দেখেছে। কান খাড়া করে মনোজ শুনতে লাগল ওদের কথা। সব বুঝতে পারল না, শুনতেও পেল না, শুধু একটা কথা শুনল—রতন বলছে—আমি জানি ক্ষুধাতৃষ্ণা আমাদের নেই। তবু সেই আগের মতো ইচ্ছে করল তোমাকে তোমার প্রিয় সন্দেশ দুটো খাওয়াই। তুমি খাবে না!

রতন তার ডান হাতটা বাড়িয়ে ধরলে গাড়ির দিকে—সে হাতে দুটো সন্দেশ। রতন আবার বলল, কই নাও—। বলার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু রতনের হাত থেকে সন্দেশ দুটো অদৃশ্য হয়ে গেল। রতন বলল—এই তো, বন্ধুর মতো কাজ হল। মনোজের গায়ে কাঁটা দিল। এ কিরে বাবা! বাড়ির মধ্যে এ কি ধরনের ভূতুড়ে কাণ্ড শুরু হল। মনোজ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আর একবার গাড়ির ভেতর দিকে তাকাল—এবার সে পরিষ্কার দেখল গাড়ির মধ্যে একটা কঙ্কাল বসে আছে। তারপর চোখ ফিরিয়ে দেখল রতনও একটু একটু করে কঙ্কাল হয়ে যাচ্ছে। মনোজের মাথা ঘুরতে লাগল।

সে স্বপ্ন দেখছে না তো? নিজের গায়ে চিমটি কেটে দেখল মনোজ। না সে তো জেগেই আছে। কিন্তু এসব সে কী দেখছে! মনোজ তার মন শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের কথা ওকে শুনতেই হবে, তারপর ভাবতে হবে এদের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায়।

রতন বলছে—দেখ স্বপনদাদাবাবু, আজও তুমি এই গাড়ির মায়া কাটাতে পারছো না। আর আমি সারকুলার ট্রেনে কাটা পড়ার পরও তোমাকে গাড়ি করে নিয়ে ঘুরছি শুধু দু'পুরুষ ধরে তোমাদের নুন খেয়েছি বলে, কিন্তু এবার তুমি নিজে মুক্তি নিয়ে আমাকেও মুক্তি দাও!

গাড়ির ভেতরের কঙ্কালটা উত্তর দিল—রতন, আমি জানি আমার জন্যে তোর খুব কষ্ট। কিন্তু তুই তো জানিস এই গাড়ির ভেতর আমার মৃত্যু হয়েছে। শীতকাল বলে গাড়ির সবক'টা কাচ তোলা ছিল। আমার আত্মাটা বেরতে পথ পায়নি। তারপর তুই জল আনতে গিয়ে মরলি। তোর আত্মাটাও আমার সঙ্গে এসে মিলল। তখন মনে হল, বেশ আছি। ভালই হয়েছে। এই গাড়িটা ছেড়ে আর আমাদের চলে যেতে হবে না। তারপর থেকে কেমন একটা মোহ পড়েছে রে। চেষ্টা করেও যেতে পারছি না। কি করি বল তো। এভাবে থাকাটাও তো একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বে।

—কি হবে দাদাবাবু! আমরা কি তাহলে কোনোদিন মুক্তি পাব না।—রতনের গলায় হতাশার সুর।

—এই গাড়ি বুঝলি, এই গাড়িটা যদি কোনোদিন ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলেই আমাদের আর কোনো বন্ধন থাকবে না। আমরা মুক্তি পেয়ে যাব।

রতন বলল—এ গাড়ি এত সহজে ধ্বংস হবে না গো, দাদাবাবু, বহুদিন এখন আমাদের এই জেলখানায় আটকে থাকতে হবে।

মনোজের সমস্ত শরীরটা কাঁপছিল। আর দাঁড়াতে পারছিল না। কোনোরকমে টলতে টলতে গিয়ে শুয়ে পড়ল। পরদিন মনোজের একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল কি করে গাড়িটা ধ্বংস করে দেওয়া যায়। গাড়িটা নিয়ে যে সে পালিয়ে যাবে তারপর পাহাড় থেকে

খাদে ঠেলে ফেলে দেবে—এসব করার উপায় নেই, কেননা সবসময় রতন আর স্বপন গাড়ির মধ্যে বসে আছে। আশ্চর্য রতনও যে ভূত সেটা সে একদম বুঝতে পারেনি। রতনের সঙ্গে কথা বলতেই তো তার অস্বস্তি হচ্ছে এখন! একমাত্র উপায় হল গাড়ি সমেত ওদের দুজনকে পুড়িয়ে মারা।—কিন্তু কি করে?

অনেক ভেবে একটা উপায় ঠিক করল মনোজ। একদিন ঠিক রাত ৯টা। মনোজ গ্যারেজে গিয়ে দেখল প্রতিদিনের মতো আজও ওরা দুজন স্বপন আর রতন বসে আছে মুখোমুখি। যদিও স্বপনকে সে দেখতে পেল না। মনোজকে দেখে অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ালেন রতন। বলুন—কিছু বলবেন?

মনোজ বলল—রতনবাবু, সারাদিন অফিসে হিসেব কষতে হয়েছে। বাড়িতে ফিরে মনে করলাম একটু রেস্ট নিলে মাথার কষ্ট কমবে, কিন্তু কমল না, ক্রমশ বেড়েই চলেছে—মনে হচ্ছে ফাঁকা কোথাও ঘুরে আসতে পারলে মাথাটাও ছাড়বে, শরীরের ক্লান্তি ভাবটাও দূর হবে। চলুন তো ভি আই পি রোড ধরে দমদমের দিকে। রাস্তাটা ফাঁকা পাব।

রতন বললেন—হ্যাঁ, রাস্তাটা এত রাতে একদম ফাঁকা থাকবে—তাতে দ্বিমত নেই কিন্তু জায়গাটা ভাল নয়।

মনোজ বলল—কি আর করবে? আমার কাছে পয়সাকড়ি কিছুই থাকবে না—হ্যাঁ, গাড়িটা নিয়ে ঝামেলা করবে তাই না, তা করুক। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি একটু রিলিফ চাই। আপনি চলুন, আর কথা না বাড়িয়ে গাড়িটা বরং বার করুন তো।

ঠিক আগের দিনের মতো মনোজের মনে হতে লাগল—গাড়ি ছুটছে যেন হাওয়ার আগে। দূর থেকে একটা বাস আসছিল। মনোজ দেখল, গাড়িটা এমন করে যাচ্ছে যেন সবকিছুর মধ্যে দিয়ে ওটা ছুটছে। আর কোনো সন্দেহ রইল না মনোজের এটা ভূতের গাড়ি। মনোজ বলল—সামনে একটা পেট্রল পাম্প দেখছি—একটু দাঁড়াবেন তো রতনবাবু।

গাড়িটা দাঁড়াতেই মনোজ একটা বড় ক্যান বের করে বলল—আপনি এই ক্যানটা ভর্তি করে নন। গাড়িতে একটা স্টকও থাকবে আবার বাড়িতে কিছুটা রাখব। অনেকসময় কিছু কাচাকাচি করতে গেলে একটু-আধটু পেট্রলের দরকার হয়।

রতন নেমে পেট্রল এনে বললেন—এটা কি পেছনে রাখব?

মনোজ বললেন—না থাক, সামনে থাক।

গাড়িটা ফাঁকা জায়গা দিয়ে যাচ্ছে। চারদিক অন্ধকার।—জনপ্রাণীহীন পথ—একটু দূরে রাস্তার ওপারে একটা পানের দোকান।

দু'পাশে কচুরিপানা। মনোজ বলল—গাড়িটা একবার রাখুন তো। মা বারবার বলেছিলেন একটু পান কিনে আনতে, একদম ভুল হয়ে গেছে।

রতন বললেন—বেশ তো, আমি আনছি। আপনি আমার হাতে টাকা দিন।

মনোজ চারটে টাকা দিয়ে বলল—জরদা দেওয়া চারটে পান। ঠিক আছে?

রতন বললেন—হ্যাঁ, ঠিক আছে।

যেই রতন চোখের আড়াল হয়েছে, মনোজ তড়িৎবেগে পেট্রোল হুড়হুড় করে ঢেলে দিতে লাগল গাড়ির ভেতর। তারপর দেশলাই বার করে একটা কাঠি জ্বেলে ছুঁড়ে দিল পেছনের সিটের ওপর। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—এ তুমি কি করলে? তোমার ঘাড় মুটকে দেব কিন্তু।

মনোজ ততক্ষণে ছুটে চলেছে। একবার পেছন ফিরে দেখল—রতন ছুটতে ছুটতে আসছে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনের দিকে। মনোজ পরিষ্কার শুনল রতন চিৎকার করে উঠল—দাদাবাবু—..... তারপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই আগুনের ভেতর। দুমদুম করে গাড়ির পার্টসগুলো ছিটকে ছিটকে পড়ছে। আশেপাশের লোকেরা ছুটে আসছে। মনোজ তাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে চিৎকার করে ওঠে—আগুন.....আগুন।

কেউ একজন পুলিশে খবর দিল হয়তো। পুলিশ যখন এল ততক্ষণে গাড়ি পুড়ে ছাই। নাম্বার প্লেটটা ঝুলছে পেছনে ফ্রেমের গায়ে। পুলিশ নোট করে নেয় নম্বরটা। সকালের কাগজে খবরটা বেরোয়নি, বোধহয় এত তাড়াতাড়ি খবর পৌঁছায়নি। মনোজ বেলা ন'টা নাগাদ থানায় একটা ডায়েরি করল এইভাবে—রতন পাণ্ডা ড্রাইভার গতকাল রাতে গাড়ি নিয়ে চলে যায়। গাড়ির নাম্বার W B B 420, নিখোঁজ গাড়িটি ছিল সাদা অ্যামবাসাডার। মালিকের নাম মনোজ সান্যাল। এরপর ড্রাইভারের ঠিকানা—আর মালিক মনোজের ঠিকানা সব নোট করে নিলেন থানার ও. সি.। পরদিন সকাল বেলা খবরের কাগজে একটা খবর বেরল। খবরটা এইরকম ঃ

ড্রাইভার মালিকের গাড়ি নিয়ে পলাতক। ভি. আই. পি রোডের এক নির্জন স্থানে এই গাড়ির সন্ধান পাওয়া যায়। গাড়িটি ভস্মীভূত। কী করে এই অগ্নিকাণ্ড লাগল বোঝা যায়নি। তবে ফরেন্সিক রিপোর্টে প্রমাণ হয়েছে—গাড়িতে দুজন আরোহী ছিল। আশা করা হচ্ছে ওর মধ্যে একজন রতন পাণ্ডা. ড্রাইভার। তবে অন্যজনের পরিচয় পাওয়া যায়নি। গাড়ির নেমপ্লেটে দেখা গেছে গাড়ির নম্বর ছিল W B B 420।

এরপর কিছুদিন ধরে চলেছিল পুলিশি খোঁজখবর. কিন্তু কিছুই সুরাহা হয়নি। অন্যদিকে মালিক মনোজ নির্লিপ্ত। সুতরাং ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটেও গেল।

বেশ কিছুদিন ভয়ে ভয়ে ছিল মনোজ রোজ মাঝরাতে উঠে দেখত—গ্যারেজে আলো জ্বলছে কিনা। ধীরে ধীরে তার সব ভয় কেটে যেতে লাগল। তবে মনোজ আর জীবনে গাড়ি কেনার নাম করবে না বলে ঠিক করল।

মোমবাতির আলোয়

অফিসের কাজে দিন পনেরোর জন্যে ইন্দ্রজিৎকে দিল্লি যেতে হল। পাশেই হরিয়ানা তার মধ্যে কার্নাল শহর। ইন্দ্রজিতের হঠাৎ মনে পড়ল রজতের কথা। স্কটিশচার্চ কলেজে ওরা একসঙ্গে বি. এসসি পড়েছে, আর কি করে জানি না ইন্দ্রজিতের সঙ্গে রজতের বন্ধুত্বটা খুব গাঢ় হয়ে উঠেছিল। যেন ওরা কতদিনের বন্ধু। লেখাপড়াতেও ছিল তেমনি ব্রিলিয়েন্ট। অধ্যাপকদের অনেক আশা ছিল ওর ওপর। কিন্তু সব আশায় ছাই দিয়ে রজত ঠিক করল ও মাউন্টেনিয়ার হবে। যে ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারত—সে হবে কিনা মাউন্টেনিয়ার। তাহলে এর জন্যে আর এতদূর পড়ার কী দরকার ছিল! হ্যাঁ। এমনি ছিল খামখেয়ালি ছেলে রজত। ওর বাড়ির লোক এসে ধরলেন অধ্যাপকদের—বোঝান। স্যারেরা বন্ধুদের বললেন— ওকে বোঝাও, বন্ধুরা এল আমার কাছে। বলল—তোকে ও খুব ভালবাসে, তুই একবার বোঝা না।

বললাম— বলছিস তোরা—বলে দেখতে পারি। কিন্তু জেনে রাখিস, যদি আমি রজতকে সত্যি চিনে থাকি তো এতে কাজ হবে না।

ইন্দ্রজিৎ শেষ চেষ্টা করল। বলল—একটা কথা বলবি রজত! এত প্রফেশন থাকতে

তুই হঠাৎ জীবন বিপন্ন হওয়া প্রফেশানের দিকে ঝুঁকলি কেন? আর ঝুঁকলি যদি তো এতদূর পড়াশোনা করে সময় নষ্ট করলি কেন? রজত রাগল না। হেসে ইন্দ্রজিৎকে পাশে বসিয়ে বলল—তুই জানিস না ইন্দ্রজিৎ—এতে কি থ্রিল আছে। কী রোমাঞ্চ! পদে পদে মৃত্যু ঘাপটি মেরে বসে আছে, আমি তাদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এগিয়ে চলেছি। কখনও ঝড়ে ভেঙে পড়া, কখনও বৃষ্টির মধ্যে চান করে যাওয়া, কোমরে দড়ি বেঁধে এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে লাফিয়ে পড়া—অসম্ভব থ্রিলিং! তুই ভাবতে পারিস! তার বদলে চেয়ারে বসে ফাইল মেনটেন করা অত্যন্ত জঘন্য একঘেয়ে কাজ। আমার এই ভাল। তাছাড়া তুই যে বলছিস, তুই কি আমাকে চাকরি দিতে পারবি? ইন্দ্রজিৎ বলে চলল অর্থাৎ চাকরি যে পাবেই এটাও কিন্তু নিশ্চিত নয়। তবে তুই আপত্তি করছিস কেন? আর পড়াশোনার কথা বলছিস, আমি আগেই সব খবর নিয়ে এসেছি বুঝলি, লেখাপড়া না জানলে ক্লাসের লেসন্‌গুলি নিতেও তো কষ্ট হবে। যে কোনো কাজে দক্ষতা অর্জন করতে গেলে কিন্তু বিদ্যেটা মাস্ট। নয়তো পারফেক্‌শান্ আসবে কি করে?

বন্ধুদের কাছে গিয়ে বললাম—আমি কোন ছাড় স্বয়ং ভগবান এলেও ওর জেদ ভাঙা যাবে না।

এরপর ক'বছর আর রজতের সঙ্গে দেখা নেই। একদিন হঠাৎ রজতের একটা চিঠি পেল ইন্দ্রজিৎ। রজত লিখেছে মাউন্টেনিয়ারিং চলছে। কিন্তু আর বোধহয় বেশিদিন চালানো যাবে না। কার্নালে এক মেজরের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। এমন জীবন বিপন্ন হওয়ার মতো পেশায় সকলের আপত্তি আছে। শ্বশুরমশাই মেজর, তিনি ওর জন্যে একটা ভাল চাকরির চেষ্টা করছেন। মনে হয় পেয়েও যাবেন কেননা কার্নালে ওনার খুব নামডাক। শেষ পর্যন্ত কি হয় পরে জানাবে বলে চিঠি শেষ করে।

ইন্দ্রজিৎ হিসেব করে দেখল চিঠিটা ও পেয়েছিল আজ থেকে বছর পাঁচেক আগে। তারপর আর কোনো যোগাযোগ রাখেনি রজত। খুব রাগ হল ইন্দ্রজিতের রজতের ওপর। ছেলেটা বরাবর একধরনের রয়ে গেল চিরকাল। ঠিকানাটা দিলে সে তো যোগাযোগটা রাখতে পারতো। হঠাৎ মনে হল ইন্দ্রজিতের, যোগাযোগ রাখার কথা মনে নেই না যোগাযোগ রাখতে চায় না বলে ইচ্ছে করেই ও ঠিকানা দেয়নি। অবশ্য এমনও হতে পারে যখন ও চিঠি লিখেছে তখন চাকরি জীবনে যে অনিশ্চয়তা রয়েছে তার কথাও লিখেছে, কোথায় যাবে কোন ঠিকানা হবে তা সে জানতো না। ভেবেছিল পরে জানাবে। যাহোক এরপর ইন্দ্রজিৎ এ নিয়ে আর কোনো চিন্তা করেনি। দিল্লি এসে এতদিন পর ওর আগে রজতের কথাই মনে পড়ল। ভাবল, কার্নাল গিয়ে একটা খবর নিলে কেমন হয়। কিন্তু ঠিকানা পাবে কোথায়?.....কিন্তু রজতের কলকাতার বাড়ির ঠিকানাটা তো ওর জানা আছে। ওখানে খবর নিলে ওরা নিশ্চয়ই বলে দেবে ওদের কার্নালের ঠিকানা। কথাটা মনে হতেই ও খুশি হয়ে উঠল। কলেজ লাইফে কতদিন ওদের বাড়ি গেছে কিন্তু টেলিফোন নম্বরটা আজ আর মনে নেই। ধুত তেরি। ঘরে কেউ ছিল না, থাকলে মনে

করত বড় সাহেবের মাথাটায় গণ্ডগোল হয়েছে। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে ইন্দ্রজিৎ হাওয়ার দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ স্বরে বলে ওঠে—রজত, ঠিকানা দিবি না তো চিঠি দিলি কেন রে? বিশাল কার্নাল শহরে কোথায় খুঁজবো বলতো তোকে।

একটু পায়চারি করল ইন্দ্রজিৎ। তারপর টেলিফোন তুলে কলকাতায় নিজের বাড়িতে ফোন করল। সোমা তার ছোট বোন, কলেজে পড়ে। সোমাই ফোনটা ধরল। ইন্দ্রজিৎ বলল—কি রে সোমা, তোরা সব ভাল আছিস তো?

—হ্যাঁ দাদা, তুমি!

—আমি ঠিক আছি। শোন, তুই আমার একটা কাজ করে দে তো।

—কি কাজ দাদা?

—আমার শোবার ঘরের দেওয়াল আলমারির একেবারে নীচের তাকে একটা পুরনো কালো ডায়েরি আছে। তাতে আমার কলেজ লাইফের বন্ধুদের সব ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখা আছে। সেখানে দেখ তো রজত মুখার্জীর নামে যে টেলিফোন নম্বর আছে, সেখানে ফোন কর। নম্বর বদলে গেলে টেলিফোনে 1951-এ ফোন করে জেনে নে। তারপর ওদের বাড়িতে ফোন করে জেনে নে কার্নালে রজত মুখার্জীর ঠিকানাটা কী। আমার ভীষণ দরকার। কিরে পারবি না?

সোমা বলল—এ আবার কি এমন শক্ত দাদা! নিশ্চয়ই পারব। তুমি আমাকে ঠিক একঘণ্টা পরে ফোন কোর কেমন?

—ঠিক আছে। তুই ফোনের কাছে থাকিস কেমন—।

—আচ্ছা দাদা। ইন্দ্রজিৎ দেখল একঘণ্টা সময় আছে যখন একবার সাইট থেকে ঘুরে আসা যাবে।

ঠিক আধঘণ্টার মধ্যেই ঘুরে এল ইন্দ্রজিৎ। সোমাকে ফোন করতে হবে। নিজের ঘরে এসে টেবিলে বসল। তখনি চোখে পড়ল একটা চিঠি। চিঠিটা খুলে ভীষণ ভাবে চমকে উঠল ইন্দ্রজিৎ। অনেকটা ভূত দেখার মতো—একি! এ সে কি দেখছে? পরিষ্কার সাদা কাগজে লেখা—রজত মুখার্জী, ভি. আই. পি. কমপ্লেক্স—এ, ৪/২/৯, কার্নাল।

তবে কি ইতিমধ্যে সোমা ফোন করেছিল! নাঃ তা কি করে হবে—ও তো দিল্লির অফিসের নম্বরটা ওকে দিয়ে আসেনি। কিন্তু এটা এল কোথা থেকে, কে আনল তাকে জানতেই হবে। পাশের ঘরে ওর পি-এ বসে টাইপ করছিল। ইন্টারকমে তাকে ডেকে পাঠাল ইন্দ্রজিৎ। বলল—এটা কে রেখেছে তুমি জান?

—না স্যার, এটা তো আনিনি। কে এনেছে তাও বলতে পারবো না।

—আমার ঘরে আমি বেরিয়ে যাবার পর কি কেউ ঢুকেছিল?

—সেটা স্যার আমি তো.....

—অপদার্থ!

—স্যার, বেয়ারা মণ্ডলকে জিগ্যেস করলে হয় না!

—বেশ তুমি যাও, আমি দেখছি।

ইন্দ্রজিৎ টেবিলের তলায় লাগানো সুইচটা টিপতেই দৌড়ে এল ইন্দ্রজিতের খাস বেয়ারা মণ্ডল। ইন্দ্রজিৎ বলল—এই চিঠিটা কে এনেছে জানো?

চিঠিটার দিকে তাকিয়ে মণ্ডল বলল—স্যার, আজ গেটে দত্ত পাহারায় আছে, ও এসে এটা আমায় দিয়ে বলল, সাহেবের টেবিলে রেখে দাও।

—ডাক তো দত্তকে। এক্ষুনি ডাক।

ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ ইন্দ্রজিৎকে এমন অশান্ত আর উত্তেজিত দেখেনি মণ্ডল। ভয় পেয়ে ও দৌড়ে ডেকে আনে দত্তকে।

ইন্দ্রজিৎ বলল—এই চিঠিটা কে আনল? কি হল, উত্তর দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন?

আসলে দত্ত এনেছিল একটা খাম আর ইন্দ্রজিৎ দেখাচ্ছে একটা খোলা চিঠি—তাই প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা। বুঝতে পেরে বলল—স্যার, ওর খামটা.....

—হোপলেস। ইন্দ্রজিৎ টেবিল থেকে খামটা তুলে বলল—এটা?

দত্ত বলল—হ্যাঁ স্যার। এটাই। আপনি বেরিয়ে যাবার ঠিক পরেই একটা লোক এলো। আমার হাতে এই চিঠিটা দিয়ে আপনার নাম করে বলল—এটা ওনাকে দিও। তারপরই স্যার যেন উবে গেল লোকটা। কোনো মানুষ যে এত তাড়াতাড়ি যেতে পারে আমার কোনো ধারণা ছিল না স্যার। তাছাড়া লোকটা কেমন যেন অদ্ভুত।

—কিরকম!—জিগ্যেস করে ইন্দ্রজিৎ।

কিম্ভূতকিমাকার, মোটা বেঁটে, কুচকুচ করছে কালো। মাড়িটাও কালো—তার ভেতর দিয়ে অসম্ভব সাদা বড় বড় দাঁত। দেখলে ভয় করে। চোখ দুটো টকটকে লাল। সমস্ত শরীর কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা, শুধু মাথাটা বেরিয়ে আছে।

—ঠিক আছে, তুমি যাও। ইন্দ্রজিৎ কিছুতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। রজতের সঙ্গে তার দেখা নেই পাঁচ বছর—কোনো চিঠি নেই, ও যে কার্নালে গিয়ে রজতের সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করেছে সেটা সে নিজে ছাড়া কেউ জানেও না। অথচ এই ঠিকানা? নাঃ, ওকে যেতেই হবে কার্নাল। ও ব্যাপারটা নিজে যাচাই করে দেখতে চায়। রজতের সঙ্গে দেখা করে সব বলবে। হঠাৎই মনে হল ইন্দ্রজিতের, আচ্ছা এমন হয়নি তো যে রজত ওর বাড়িতে ফোন করে দিল্লির ঠিকানা জেনে চিঠি পাঠিয়েছে আমার জন্যে! কিন্তু তাহলে চিঠিতে তো দু'কলম লিখে দেবে। তাও তো নয়। তবে? বাড়ি....বাড়ির কথা মনে পড়তেই মনে হল সোমা বসে আছে টেলিফোনের কাছে। ঘড়ি দেখে লজ্জিত হয়ে পড়ল। যাঃ, দেড়ঘণ্টা হয়ে গেল। দেখি সোমা আবার হতাশ হয়ে বেরিয়ে গেল কিনা। দুটো জিনিস সোমার কাছে সে জানতে চাইবে। এক রজত ফোন করেছিল কিনা, আর দুই হল রজতের ঠিকানা। ফোন করতেই সোমা বলল—কিরে দাদা, কখন থেকে অপেক্ষা করছি, কাজে আটকে গিয়েছিলি বুঝি!

—না রে আর বলিস না, যত ঝামেলা। তুই বল তো আগে রজত করে কি কেউ ফোন করেছিল?

—না—কেউ ও নামে ফোন করেনি।

—তুই সিওর?

—নিশ্চয়ই। কারণ আজ চার-পাঁচদিন আমার কলেজ বন্ধ। ফোন যত এসেছে আমিই তো ধরেছি।

—আচ্ছা, এবার ঠিকানা বল। পেয়েছিস তো?

—হ্যাঁ! লিখে নে—রজত মুখার্জী—এ. ৪/২/৯ ভি. আই. পি. কমপ্লেক্স—কার্নাল। ঠিক আছে?

—হ্যাঁ, রাখছি।

ফোন ধরে কথা বলার মতো শক্তি আর ছিল না ইন্দ্রজিতের। পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে শুধু তাকিয়ে আছে সামনে রাখা লেখা ঠিকানার দিকে। তারপর ইন্টারকমে ডাকে অফিসার চ্যাটার্জীকে। চ্যাটার্জী আসতেই ইন্দ্রজিৎ তাকে কাজ বুঝিয়ে দেয়। দু'দিনের জন্যে সে কার্নাল যাচ্ছে—এই দু'দিনের চার্জে থাকবে চাটার্জী। সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। ঠিক হল, কাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে ও অফিসের একটা গাড়ি নিয়েই কার্নাল যাবে।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সারাদিনের কথাই ভাবছিল ইন্দ্রজিৎ। হঠাৎ খুব আস্তে আস্তে কে যেন দরজায় টোকা মারছে শুনতে পেল। প্রথমটা অবশ্য অতটা বুঝতে পারেনি, বেশ খানিকক্ষণ পরে ওর খেয়াল হল। ঘড়ি দেখল রাত দুটো। এত রাতে তাকে কে ডাকছে! দরজা না খুলেই সাড়া নিল ইন্দ্রজিৎ—কে! এত রাত্রে কে দরজা ঠেলছেন? খুব দূর থেকে একটা ক্ষীণকণ্ঠ ভেসে এল—ই....ন্দ্র....জি....ৎ, ই....ন্দ্র....জি....ৎ....এ কার কণ্ঠ? দড়াম করে দরজা খুলল ইন্দ্রজিৎ। ও স্পষ্ট শুনেছে রজতের গলা। রজত তাকে ডাকছে। কার্নাল থেকে কি তবে সে ছুটে এসেছে দিল্লিতে? পরিস্থিতির চাপে ইন্দ্রজিতের আর বিচারশক্তি ছিল না, কিন্তু কোথায় কি! কেউ তো নেই। এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া ঢুকে গেল ঘরে। ইন্দ্রজিৎ দরজা বন্ধ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল। তাহলে কি সবটা তার মনের কল্পনা? এত রজতের কথা চিন্তা করছে বলেই কি সে এসব শুনছে, দেখছে?

পরদিন ঠিক দুটো নাগাদ যাত্রা করল ইন্দ্রজিৎ। দিল্লি থেকে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে কার্নালের পথে।

সন্ধে ছ'টা বেজে গেল কার্নাল পৌঁছতে। তারপর ঠিকানা খুঁজে বার করতে গিয়ে আরও দেরি হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত ঠিকানা পেয়ে ইন্দ্রজিতের গাড়িটা এসে দাঁড়াল রজতের ফ্ল্যাটের সামনে। বাড়ি তিনতলা। নীচের একতলার ফ্ল্যাটটাই রজতদের। দরজা দিয়ে ঢুকেই ওপরে যাবার সিঁড়ি। দু'ধারে দুটো ফ্ল্যাট। ডান দিকের ফ্ল্যাটের দরজার গায়ে লেখা রজত মুখার্জী। ইন্দ্রজিৎ ড্রাইভারকে বলল—গাড়িটা একটু দূরে পার্ক করে রাখ। আজ রাতটা এখানে থেকে কাল ভোরবেলাই রওনা দেব। তুমি গাড়িতেই রাতটা কাটিয়ে দিও।

ড্রাইভার মাথা নেড়ে চলে গেল। ইন্দ্রজিৎ ফ্ল্যাটের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কলিং বেলটা টিপতে লাগল। কিন্তু বারবার টিপেও কোনো সাড়া পেল না। তাহলে কি কেউ

নেই? ইন্দ্রজিৎ দেখল, না তো, ভেতর থেকে যখন বন্ধ তখন নিশ্চয়ই আছে। তবে হয়তো কলিং বেলটাই খারাপ। প্রথমে একটু আস্তে করেই ডাকল ইন্দ্রজিৎ--রজত.....রজত বাড়ি আছিস?

নাঃ। চেঁচানো উচিত হবে না। ভদ্রলোকের বাড়ি। অন্য ফ্ল্যাটের লোকেরা বিরক্ত হবে। ইন্দ্রজিৎ এবার কড়া নাড়তে শুরু করল। অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ার পর যখন সাড়া না পেয়ে ফিরে যাবার কথা ভাবছে তখন হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। ভেতরটা চুপচুপে অন্ধকার। চোখটা কেমন ধাঁধিয়ে গেল ইন্দ্রজিতের। খানিক পরে চোখটা একটু সয়ে যেতে দেখল দূরে খুব টিমটিমে একটা মোমবাতি জ্বলছে, সেই মোমবাতির আলোয় আবছা ছায়ার মতো দেখা যাচ্ছে এক মহিলাকে। তাকে দেখতে কেমন, তার বয়স কত কিছুই বোঝা গেল না। মহিলা খুব ধীরে ধীরে বললেন—আসুন ইন্দ্রজিৎবাবু। আমি রজতের স্ত্রী মিতা। ও একটু বেরিয়েছে, এক্ষুনি এসে পড়বে।

—আলোটা.....একটু লজ্জিত ভাবে কথাটা বলে ইন্দ্রজিৎ।

মিতাও মৃদুকণ্ঠে বলে—সরি ইন্দ্রজিৎবাবু। সব ফিউজ হয়ে গেছে। আসলে লাইনে কি সব গণ্ডগোল হয়েছে; কাল মিস্ত্রি এসে কাজ করবে বলেছে। আজকের রাত্তিরটা আপনাকে একটু কষ্ট করে কাটাতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে—আপনি কি বলছেন মিতা দেবী! এতে আমার কোনো কষ্ট হবে না।

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল ইন্দ্রজিৎ। মিতা এমন সব কথা বলছে—যেন ওরা জানে ও আসবে, রাত্তিরে থাকবে।

—এসব কি করে হল? কথাটা আর চাপতে পারল না ইন্দ্রজিৎ, বলেই ফেলল—কিছুতেই বুঝতে পারছি না আপনি কি করে.....

মিতা ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল—আপনি কি দরজাতেই দাঁড়িয়ে থাকবেন? আসুন, ভেতরে এসে বসুন।

ইন্দ্রজিৎ বুঝল মিতা কথা ঘোরাচ্ছে। হেসে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন, ভেতরে যাই।

সামনেই সোফা দিয়ে সাজানো ঘর। ইন্দ্রজিৎকে ঘরে বসিয়ে মিতা বলল—আপনার বন্ধু বলছিল কতদিন যে আপনাদের একসঙ্গে দেখা হয়নি তাই—আপনি খাবেন বলে ও নিজে হাতে বাজার করতে গেছে। এক্ষুনি এসে পড়বে।

আবার ইন্দ্রজিৎ অবাক হয়ে বলল—আমি তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা—

আবার ওকে থামিয়ে মিতা বলল—একটু বসুন, আপনার জন্যে আগে একটু কফি করে আনি.....

ইন্দ্রজিৎ বলে—আমি তো.....

মিতা আবার ওকে থামিয়ে বলে--কফির সঙ্গে আমি কিন্তু একটু টুকিটাকিও দেব। কেননা খেতে তো সেই রাত—আপনি কিন্তু কোনো আপত্তি করবেন না।

মিতা ভেতরে চলে গেল। একা বসে ইন্দ্রজিৎ ভাবছে—মিতা যতই এড়িয়ে যাক সে কিন্তু বলবেই। ওকে জানতেই হবে রহস্যটা। মিতা ট্রে হাতে ঢুকতেই ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি করে কথাটা বলে ফেলে—কি আশ্চর্যের ব্যাপার—জানেন, আপনাদের ঠিকানা লেখা একটা চিঠি কে যেন আমার টেবিলের ওপর রেখে গেছে। আচ্ছা, আপনারা কি করে জানলেন বলুন তো আমি দিল্লি এসেছি!

মিতা ইন্দ্রজিৎকে আর বাধা দেয়নি। ট্রে থেকে খাবার নিয়ে ওর হাতে দেবার সময় বলে ওঠে—আপনার জামাকাপড় এনেছেন তো রাতের জন্যে?

—হ্যাঁ। গাড়িতে আমার অ্যাটাচিটা আছে। ড্রাইভারটাকে বললে পৌঁছে দেবে। আমায় কিন্তু কাল খুব ভোরেই রওনা দিতে হবে। অফিস আছে না?

মিতা বলল—তাই হবে, এখন আপনি খেয়ে নিন।

এতক্ষণে খেয়াল হল ইন্দ্রজিতের, হয় তো মিনিট পাঁচেকও হয়নি তার মধ্যে কি করে মহিলা এত পকোড়া, চিপস সব বানালেন!

খেতে খেতে ইন্দ্রজিৎ বলল—রজত তো এখনও ফিরল না। ও এলে একসঙ্গে খাওয়া যেত। আপনিও নিন!

মিতা বলল—আমরা দুজনেই খেয়েছি, আপনি খান।

খাবার মুখে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলে ওঠে—বাঃ, চমৎকার তো আপনার হাতের রান্না। অপূর্ব হয়েছে। মিতা খুশি হল কিনা দেখার জন্যে ওর মুখের দিকে তাকাল ইন্দ্রজিৎ, কিন্তু সেই আধো আলো আধো অন্ধকারে মিতার মুখের ভাব কিছুই বোঝা গেল না। হঠাৎ রজতের গলা। হৈ হৈ করতে করতে চেঁচামেচি করে উল্লাস প্রকাশ করার অভ্যাসটা রজতের বরাবরের। আজও সে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে চেঁচিয়ে ওঠে—কোথায়, কোথায় সেই দুশমনটা—আমার পরম শত্রু—ডুমুরের ফুল কোথায়?

বলতে বলতে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ইন্দ্রজিৎকে। বলে, বিশ্বাস কর, এতদিন পর তোকে আমি দেখতে পাব এসব আমি ভাবতেও পারিনি। ওঃ, আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে না, তোকে কি বলব!

রজতের হাত ধরে ইন্দ্রজিৎ বলে ওঠে—কতক্ষণ এসেছি জানিস? তোর তো পাত্তা নেই।

—সরি রে। বলল রজত। তোর জন্যে একটু বাজার করে নিয়ে এলাম। জানিস, মিতার হাতের রান্না খুব ভাল। তারপর গলাটা একটু চড়িয়ে বলে ওঠে—মিতা, জমিয়ে রান্না কর দিকি দু'বন্ধুর জন্যে।

ইন্দ্রজিৎ কিন্তু আবার একটা অস্বস্তি বোধ করছে।

রজত ওকে যখন জড়িয়ে ধরল বা ও যখন রজতের হাতটা ধরল তখন ও অনুভব করল রজতের সমস্ত শরীর বরফের মতো হিমশীতল। কেন? বাইরে থেকে এসেছে বলে? হঠাৎ ওর মনে হল এবারে ঐ প্রসঙ্গটা তোলা যেতে পারে—তাতে রহস্যের

সমাধান হবার সুযোগ আছে। ইন্দ্রজিৎ বলল—হ্যাঁরে—তুই জানতিস আমি আসব? বাজার করে আনলি যে—।

—নিশ্চয়ই। আলবাৎ জানতাম। জোর দিয়ে বলল রজত।

—কিন্তু আমি তো তোকে কোনো চিঠিও দিইনি, ফোনও করিনি—কাউকে দিয়ে খবরও পাঠাইনি, তবে জানলি কি করে?

হাহা করে হেসে রজত বলে ওঠে—স্রেফ টেলিপ্যাথি বন্ধু, স্রেফ টেলিপ্যাথি। টেলিপ্যাথি বলে একটা ব্যাপার আছে বিশ্বাস করিস নিশ্চয়ই। মনে মনে খবর পৌঁছে যায় বুঝলি। তুই দিল্লি এসেছিস। আমাকে খুঁজছিস—আমার ঠিকানা পাচ্ছিস না—তোর অস্থিরতা আমার মনে এসে ধাক্কা দিয়ে সব জানিয়ে দিয়েছে। বুঝলি কিছু? বুঝবি না, বুঝবি না। এসব বোঝার মতো ক্ষমতা তোদের নেই। তোরা খালি অফিসিয়াল ওয়ার্কই করতে পারিস। ছাড় তো ওসব কথা, তোর জামাকাপড়ের অ্যাটাচিটা কোথায়, গাড়িতে!

রান্নাঘর থেকে মিতা চেঁচিয়ে বলে—ওটা ইন্দ্রজিৎবাবুর ঘরে রাখা হয়েছে। তুমি ওঁকে ঘরে নিয়ে যাও। আমার রান্না হলে ডাকব।

আবার দোটানায় পড়ল ইন্দ্রজিৎ। বাইরে বেরোবার রাস্তা তো একটাই—ও তো তখন থেকে এই ঘরেই বসে আছে। কই, কেউ তো ঢোকেনি বা বেরোয়ওনি। অথচ....। ইন্দ্রজিতের চিন্তায় ছেদ পড়ল। রজত বলল—চল, ঘরে চল।

এ ঘরেও টিমটমে মোমবাতি। কিন্তু ইন্দ্রজিতের চোখ এখন বেশ সয়ে গেছে। দেখল চমৎকার ছিমছাম পরিপাটি করে সাজানো একটা বেডরুম। রজত বলল—এটা আমাদের গেস্টরুম। দেখ, পছন্দ হয়েছে তো? তবে ইলেকট্রিক নেই তো, তোর খুব কষ্ট হবে। কিন্তু কি করব বল—এমন একটা ব্যাপার।

ধমক দিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল—থাম তো। পাখা আলো আমার কোনোটাই দরকার হবে না। এখনও একটু একটু ঠান্ডা আছে। পাখা থাকলেও আমি পাখা চালাতাম না। তাছাড়া আমরা কলকাতার লোক। রজত, ভুলে গেলি দিনের পর দিন লোডশেডিং-এ আমাদের লেখাপড়ার কথা।

ইন্দ্রজিতের কথা শুনে হেসে ফেলে রজত। বলে— সেসব দিনগুলো কত আনন্দের ছিল, তাই না! ছোটবেলার দিনগুলো আমাদের সুখস্মৃতি তাই নারে?

—হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস। বলল, ইন্দ্রজিৎ। তা তুই তো কলকাতা ছাড়লি মাউন্টেনিয়ার হবি বলে। তা সব ছেড়েছুড়ে দিলি কেন?

—কি আর বলব বল। দুঃখ করে বলে রজত—সকলে আমার বিরুদ্ধে চলে গেল। কেউ আর ট্রেকিং-এ যেতেই দিতে চাইল না। বলল—জীবন বিপন্ন করা খেলা আর খেলা হবে না। আমার জীবনের সঙ্গে এখন নাকি আরো কয়েকটা জীবন জড়িয়ে গেছে।

—কথাটা ঠিক। ভালই করেছিস ছেড়ে দিয়ে। তা এখন কি করছিস কাজকর্ম?

শ্বশুরমশাই চাকরি করে দিয়েছিলেন। আমার দুর্ভাগ্য দু'বছর হল সেই কোম্পানিটা উঠে গেল। তারপর বেকার। শেষকালে টুকিটাকি একটা কাজ ধরলাম।

—টুকিটাকি মানে.....? প্রশ্ন করে ইন্দ্রজিৎ।

রজত কিছু বলার আগেই ভেতর থেকে মিতা ডাকে—এস সব, খাবে এস।

দুই বন্ধুতে কথা বলতে বলতে রাত হয়েছে খেয়াল করেনি। রজত বলল, রাত ন'টা বেজে গেছে। চল, কাল আবার তোকে ভোরে উঠে বেরতে হবে।

—হ্যাঁ, চল। ইন্দ্রজিৎ সঙ্গে খাবার ঘরে এসে রীতিমতো অবাক হয়ে গেল। মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে একহাতে এত রান্না করা কারো পক্ষে যে সম্ভব সে কথা না দেখলে বোধহয় বিশ্বাস করা যায় না। ইন্দ্রজিৎ হেসে বলল—এ কি করেছেন মিতাদেবী! আমার বোনকে গিয়ে বলতে হবে তোরা কি ভাবতে পারবি দু'ঘণ্টায় ক'টা পদ রান্না করা যায়!

মিতা লজ্জা পেয়ে বলে—কি যে বলেন আপনি!

খাবার পর চোখ জড়িয়ে এল ইন্দ্রজিতের। ঘরের দরজা অব্দি রজত এলো। বলল—গুড নাইট। কাল সকালে আবার দেখা হবে।

ইন্দ্রজিৎ ঘরের দরজাটা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল আর নিমেষের মধ্যে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল।

তখন কত রাত হবে কে জানে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ইন্দ্রজিতের। প্রচণ্ড চেঁচামেচি শোরগোল বাইরে। তার দরজাতেও কে যেন প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারছে। ঘুম ভেঙে প্রথমটা হতচকিত হয়ে পড়েছিল ইন্দ্রজিৎ। তারপর বুঝতে পারল রজত চাপা গলায় বলছে দরজার পেছন থেকে—ইন্দ্রজিৎ, শিগ্গির দরজা খোল—দরজা খোল, আমাদের ভয়ানক বিপদ।

ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দেয় ইন্দ্রজিৎ। দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে রজত আর মিতা। বিধ্বস্ত চেহারা।

সেই মোমবাতির টিমটিমে আলোতে এই প্রথম ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল ইন্দ্রজিৎ। রজত আর মিতার মুখ দুটোই রক্তশূন্য। বোধহয় ভয়ে। রজত অবাক হয়ে বলল—কি ব্যাপার বল তো।

রজত ইন্দ্রজিতের হাত দুটো ধরে বলল—আমাদের খুব বিপদ রে রজত। তুই আমাদের বাঁচা।

—কিন্তু কি ভাবে—আর কেন?

রজত উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে সব কথা বলার সময় নেই—ওরা যেভাবে ধাক্কা দিচ্ছে এখুনি ভেঙে ফেলবে। এরা হল মোহন সিং-এর দল। চাকরি যাবার পর আমি না জেনে এদের পাল্লায় পড়েছিলাম টাকা রোজগারের জন্য। পরশুদিন ওরা আমাকে পাঁচলাখ টাকা দিয়ে এক জায়গায় পাঠিয়েছিল। আমার ধারণা ওদের লোকই টাকাটা

আমার কাছ থেকে ছিনতাই করে পালায়। কিন্তু মোহন সিং সেকথা বিশ্বাস করছে না—আমাকে খুন করবে বলে শাসিয়েছিল। আজ ওরা এসেছে আমার বাড়ি চড়াও করে আমাদের খুন করবে বলে। একমাত্র তুই-ই পারিস আজ আমাদের বাঁচাতে।

—কি ভাবে? আমি কি করব বুঝতে পারছি না।

ইন্দ্রজিৎ হতভম্বের মতো হয়ে গেছে পরিস্থিতির চাপে।

রজত বলল—তুই গিয়ে বল ওরা কেউ বাড়ি নেই। বাড়িতে তুই একা আছিস।

—যদি জিগ্যেস করে তুমি কে? কি বলব?

—বলবি আমি ওর পেয়িং গেস্ট। প্লিজ আর দেরি করিসনি ইন্দ্রজিৎ, যে কোনো মুহূর্তে ওরা ঢুকে পড়বে।

ইন্দ্রজিৎ বলল—কিন্তু আমি দরজা খুললেও ওরা কিন্তু তল্লাশি চালিয়ে ঠিক খুঁজে বার করবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ জানি, তাই আমরা ঐ শোবার ঘরের ওয়ার্ডরোবের মধ্যে লুকোবো। অনেকটা জায়গা আছে। তুই শুধু স্যুটগুলো আমাদের সামনে ঘন করে মেলে দিস যেন না বুঝতে পারে।

—ঠিক আছে, যা। ইন্দ্রজিৎ আর রজত-মিতা ঘরের দরজার বাইরে পা রাখল—আর ঠিক সেই সময় প্রচণ্ড শব্দ করে ভেঙে পড়ল সদর দরজা। ইন্দ্রজিৎ হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল। নড়তে পারল না। আর রজত এবং মিতা ছুটে চলে গেল স্যুটের আলমারির দিকে। ইন্দ্রজিৎ দেখল দশ-বারো জন লোক। কালো মুখোশ পরা, হাতে স্টেনগান, পরনে খাকি ড্রেস। পিলপিল করে এসে ঘিরে ফেলল ওদের তিনজনকে। দশ-বারোটা বন্দুক ওদের দিকে তাগ করা। ওদের মধ্যে একজন ইন্দ্রজিতের কাছে এসে বলল—এটা কে? অ্যাঁ! এটাকেও শেষ করে দেব নাকি!

ইন্দ্রজিৎ প্রচণ্ড ভয় পেল। বলল—আমি কলকাতার মার্চেন্ট অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। দিল্লি এসেছি কাজে।

—তা মরতে এখানে কেন? রাইফেলের খোঁচা পেটে লাগিয়ে জিগ্যেস করল একটা ষণ্ডা চেহারার লোক।

—দিল্লি এসেছিলাম। অনেকদিন বন্ধুর খবর পাইনি তাই খবর নিতে এসেছিলাম কার্নালে।

—ও! বলে লোকটা আর একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, এটাকে মেরে কি হবে?

—ছেড়ে দে। হ্যাঁ, তবে সাবধান। ওকে বলে দে উল্টোপাল্টা কথা যদি বলে বেড়ায় তো ঐ মুখ চিরকালের জন্যে বন্ধ করে দেব।

লোকটা আবার ইন্দ্রজিতের পেটে খোঁচা মেরে বলল—ঠিক আছে! সব শুনলি তো?

ইন্দ্রজিৎ প্রাণভয়ে বলে ওঠে, শুনেছি। আমি কাউকে কোনো কথাই বলব না।

ওরা রজতকে জিগ্যেস করল কি হল রে টাকার, হ্যাঁ?

—আমি দিয়ে দেব। একটু সময় দাও। বৌয়ের সব গয়না বেচে আমি শোধ করব।

—তাই বুঝি! তা গয়নাগুলো আছে কোথায় বল। ওগুলো আমরাই বেচে টাকাটা নেব! এই—তোরা সব আলমারিতে দেখ তো কি পাস, ততক্ষণে এদের যাবার ব্যবস্থাটা করে দিই।

উল্লসিত হয়ে ওঠে রজত। বলে ওঠে—ছেড়ে দেবে আমাদের?

হাহা করে হাসে দৈত্যগুলো, বলে—কি সর্দার, এদের মুক্তি দিয়ে দিই?

—দিয়ে দে, সময় নষ্ট করে কি হবে—তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে।

ইন্দ্রজিতের চোখের সামনে দুটো ঘটনা ঘটল। এতগুলো বন্দুকের সামনে সে অসহায় পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে রইল। একদল ঘরের সবকিছু ওলোটপালোট করছে আর আরেকটা দল ওদের ওপর রাইফেল তাগ করে রেখেছে। ওদের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠল—এখনও বল, টাকাটা কোথায়?

রজত প্রায় কাঁদ কাঁদ হয়ে বলল—বিশ্বাস করো ও টাকা আমি নিইনি। তোমাদের লোকই ছিনতাই করে নিয়েছে আমার কাছ থেকে। নয়তো কেউ তো জানতো না আমার হাতে টাকা আছে।

লোকটা রেগে গরগর করতে লাগল। বলল—তোর এতবড় আস্পর্ধা! নিজে দোষ করে এখন দলের মধ্যে ভাঙন ধরাবার ধান্দা করছিস। সে সুযোগ তোকে আমরা দেব না, বুঝলি।

লোকটার চোখের ইশারায় সাত-আটটা রাইফেল একসঙ্গে গর্জে উঠল। দেখতে দেখতে ইন্দ্রজিতের চোখের সামনে মিতা আর রজতের রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

ইন্দ্রজিৎ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। ভোরের আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। ইন্দ্রজিৎ চোখ মেলল, সে কোথায়! আস্তে আস্তে তার সব কথা মনে পড়ল। সে এসেছিল রজতের কাছে। রাতে খাওয়া-দাওয়া তারপর ঘুমতে যাওয়া আর তারপরই সেই বীভৎস নারকীয় হত্যাকাণ্ড। আঁতকে উঠল ইন্দ্রজিৎ। কিন্তু এ কি! এ সে কি দেখছে? ফাঁকা ঘর। একটাও আসবাবের চিহ্নমাত্র নেই। চারদিকে ধুলো ভর্তি, মেঝেতে কয়েকটা জুতো-পরা পায়ের ছাপ ধুলোর ওপর.....এগুলো যে তারই পায়ের ছাপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সন্ধে থেকে আজ ভোর পর্যন্ত সে একা এ ঘরে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে না কি! যা সে দেখেছে তা কি সব স্বপ্ন! বাইরে গাড়ির হর্ন। ইন্দ্রজিৎ বুঝতে পারল ড্রাইভার ফিরে যাবার জন্যে তাড়া দিচ্ছে। ও উঠল। অ্যাটাচিটা বন্ধ অবস্থায় তার পাশেই পড়েছিল। সেটা হাতে তুলে নিল। তারপর প্রায় টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে বসার ঘরের মধ্যে এলো। না কোথাও এতটুকু চিহ্ন নেই কালকের যাতে সে বিশ্বাস করতে পারে ঘটনাটা ঘটেছিল কিনা। আবার হর্ন. ইন্দ্রজিৎ নিজের হাতঘড়ি দেখল। সকাল প্রায় সাতটা। এখন না বেরোলে পৌঁছতে

অনেক বেলা হয়ে যাবে। অফিসে ওকে একবার যেতেই হবে। গাড়ির কাছে একটু দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। একটা রহস্যের সমাধান করতে গিয়ে আরও একটা রহস্য তৈরি হল।

ইন্দ্রজিৎ ড্রাইভারকে জিগ্যেস করল—আচ্ছা, তুমি কাল রাত্তিরে কোথায় শুয়েছিলে?

—কেন স্যার, গাড়িতে। ড্রাইভার উত্তর দেয়।

—না বলছিলাম কি রাত্তিরে কোনো চেঁচামেচি শুনেছিলে বা কোনো হট্টগোল!

—না তো স্যার। কিন্তু স্যার, আপনি এসব কথা কেন জিগ্যেস করছেন? আপনার শরীর ভাল আছে তো, স্যার!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি। এবার চল।

বলে ইন্দ্রজিৎ গাড়ির মধ্যে উঠে পড়ে। মনের মধ্যে একটা খচখচ লেগেই আছে। সামনে বেশ কয়েকজন জগিং করছিল। ইন্দ্রজিৎ ড্রাইভারকে বলে ওদের কাছে গাড়ি নিয়ে যেতে। গাড়ি দেখে অনেকে এগিয়ে এলো ইন্দ্রজিতের কাছে।

—আপনি কি কোনো নম্বর খুঁজছেন? ওদের মধ্যে যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ তিনি বললেন। আমি কিন্তু কাল সন্ধেবেলাও আপনাকে দেখেছি। কোন বাড়ি? কত নম্বর ঠিকানা? বলুন তো।

ইন্দ্রজিৎ একটু চুপ করে থেকে বলল—আমি ঐ রজতের কাছে এসেছিলাম।

—দেখা হল? মুখ টিপে একটু হাসল পাশের যুবকটা। বলল—অনেক পুণ্য করেছিলেন স্যার, তাই বেঁচে গেলেন। আজ অব্দি কেউ ঢোকা তো দূরের কথা ও দিকে পা পর্যন্ত বাড়ায়নি।—তা আপনি কে হন রজতবাবুর?

—আমি ওর বহুদিনের বন্ধু।

—ও তাই বলুন। বন্ধু! তাই বেঁচে গেলেন।

—তা আপনি বোধহয় ওঁদের খবরটা পাননি তাই বন্ধুকে দেখতে এসেছিলেন, তাই না?

—ঠিক তাই। কিন্তু.....রজত.....মিতা.....

ছেলেটি বলল, ওসব ভৌতিক ব্যাপার। যা ঘটেছিল সেটা শুনুন। আজ থেকে দু'বছর আগে এমনি সময় ঐ বাড়িতে বীভৎস একটা নারকীয় কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। আমরা পাশাপাশি থেকেও কেউ কিছু করতে পারিনি। তবে এরকম যে একটা পরিণতি হবে তা কিন্তু আমরা আগেই আন্দাজ করেছিলাম।

—কেন? আপনাদের এটা মনে হল কেন?

এবার বৃদ্ধ লোকটি বলে ওঠেন—আসলে রজতবাবুর সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসতেন তাঁদের দেখলে বোঝা যেত লোকগুলো সুবিধের নয়। এখানে কুখ্যাত এক স্মাগলার আছে—তার নাম মোহন সিং। শোনা যেত, রজতবাবু নাকি ওদের পাল্লায় পড়েছিলেন। আপনিই বলুন না ভাই, রজতবাবুর কি এমন কাজ ছিল—যে রাত দুটো তিনটেতে বাড়ি ফিরতে হত। আর বেরতেন কখন জানেন? রাত দশটার পর।

আরে মশাই, আমরা তো গোবলি করতাম—লোকটার এত টাকার দরকার কি—দুটো তো প্রাণী, দিব্যি চলে যেত সামান্য কাজ করলে। আর ঠিক ঘটলও ব্যাপারটা। দেখুন, একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দুজনকে হত্যা করে গেল মোহন সিং-এর দল।

ইন্দ্রজিৎ বুঝল সে যা দেখেছে গতরাতে সব সত্যি। তবে সেটা দু'বছর আগের এক রাতের ঘটনা। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ওদের কাছে বিদায় জানিয়ে ইন্দ্রজিৎ ড্রাইভারকে বলল—চল, স্টার্ট দাও গাড়িতে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক একটু থামালেন ইন্দ্রজিতকে। বললেন—আর একটা কথা বলি। জানি না আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা, এই ফ্ল্যাটটা লোকে বলে ভূতুড়ে। প্রায়ই ওখানে মাঝরাতে টিমটিমে আলো জ্বলতে দেখা যায়। আমরা তো রাত্তিরের দিকে ওদিকটা আর যাই না। তা দেখুন না, আপনি তো বন্ধু লোক। যদি শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করে ওদের দুটো আত্মাকে মুক্ত করা যায়।

ইন্দ্রজিৎ ওদের দিকে তাকিয়ে বলল—আপনার কথাটা আমার মনে থাকবে। আচ্ছা চলি, নমস্কার।

প্রতিহিংসা

কলকাতা থেকে মাইল দশেক দূরে একটা ছোট্ট গ্রাম। নাম 'মানহারা'। কিছুদিন ধরে গ্রামে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে, মাঝেমধ্যে হঠাৎ হঠাৎ মানুষ মারা যাচ্ছে। বিশেষ করে রাত করে যারা বাড়ি ফিরছে তাদের মধ্যে অনেকেই প্রাণ হারাচ্ছে। চারদিকে হৈচৈ পড়ে গেল—পুলিশ, থানা, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কেউ কোনো কারণ খুঁজে পেল না। গ্রামের মধ্যে একটা অজানা আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল। সন্ধের পর আর কেউ বাড়ির বাইরে যাচ্ছে না। যাদের রাত করে ফিরতেই হচ্ছে তারা বড় বড় টর্চ নিয়ে দল বেঁধে ফিরতে লাগল। আর এটাই আশ্চর্য ব্যাপার, যারা প্রাণ হারিয়েছে তারা কেউই দলের সঙ্গে নয় একাই ছিল।

মানহারা গ্রামের দুটো বাড়ি নামকরা। একটা হল গ্রামের এক প্রান্তে নবীন দত্ত আর অন্য প্রান্তে রতন ঘোষের বাড়ি। নবীনবাবু আর রতনবাবু দুজনেই ছিলেন দুজনের

পরম বন্ধু। তাঁরা আজ বেঁচে নেই। তাঁদের ছেলে মহিম দত্ত আর রমেশ ঘোষ ঐ বাড়ি দুটির মালিক। দুটো পরিবারের মধ্যে এখনও আত্মীয়তা বজায় আছে। তাই একটু দূরে হলেও রমেশ ঘোষের মেয়ে লক্ষ্মী প্রায়ই যায় দত্তবাড়ি, ওদের বাড়ির লোকেরাও আসে রমেশ ঘোষেদের বাড়ি। দুটো বাড়িতেই প্রায় একই সঙ্গে দুটো অঘটন ঘটে গেল। একই সঙ্গে লক্ষ্মীর আর মহিম দত্তের ছেলে নান্টুর বিয়ের ঠিক হল। প্রায় একই দিনে দুজনের বিয়েও হয়ে গেল। লক্ষ্মীর বিয়ে হল পাশের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে। আর নান্টুর বিয়ে হল সেই গ্রামেরই এক কবিরাজের মেয়ে নলিনীর সঙ্গে। ঠিক একমাস পরে লক্ষ্মী বিধবা হয়ে ফিরে এলো বাবার কাছে আর নান্টুর বউ নলিনী হঠাৎ গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরল।

লক্ষ্মীর ভাই রজত কলকাতার কলেজে পড়ে। মেসবাড়িতে থাকে। প্রত্যেক শুক্রবার বাড়ি ফেরে আর রবিবার রাতে আবার কলকাতায় ফিরে যায়। গ্রামে যখন এরকম অবস্থা চলছে তখন একদিন সন্ধেবেলা রজত বাড়ি এল। লক্ষ্মী ঘরদোর সাজিয়ে কতরকম রান্না করে রাখে প্রত্যেক শুক্রবার ভায়ের জন্যে। কিন্তু এবারে রজত একটু অবাক হল। দিদি যেন কেমন অন্যমনস্ক। প্রত্যেকবার রজতকে দেখে খুশিতে জড়িয়ে ধরে লক্ষ্মী। কিন্তু আজ একটু হেসে এড়িয়ে গেল। বেশ চিন্তা পড়ল রজত। মার কাছে একটা কথা শুনে চিন্তাটা আরও বাড়ল রজতের। লক্ষ্মী নাকি সারাদিন স্বাভাবিক থাকে কিন্তু অন্ধকার হলেই অন্যরকম হয়ে যায়। রজত ঠিক করল, দিদিকে ডাক্তার দেখাবে। হতেই পারে, অল্পবয়সে তো খুব শোক পেল।

সত্যিই তাই। সকালবেলা লক্ষ্মী আবার সেই আগের মতো। ভাইকে দেখে বলে ওঠে—ওঃ, তোর জন্যে আমি সারা সপ্তাহ বসে থাকি। জানিস, নিজে রান্না করি, মাকে করতে দিই না। তাছাড়া মার তো বয়স হল, বল না? রজত হেসে বলল—সে তো বটেই। লক্ষ্মী তার স্বভাবসুলভ চপলতা দিয়ে বলল—জানিস ভাই, তুই এবার থেকে যখন আসবি সন্ধে করবি না, আর দলবেঁধে আসবি। শুনেছিস তো গ্রামে কি সব ঘটছে।

রজত বলল—তুই চিন্তা করিসনি, দিদি। আমি ঠিক থাকবো।

রাগ করে বলে ওঠে লক্ষ্মী—থাক থাক আর, বেশি তড়পাসনি তো।

দিদির ভয় দেখে হেসে ফেলে রজত। এই তো দিদি তো আগের মতোই আছে, তবে মা মিথ্যে ভয় পাচ্ছিল।

নাঃ, সন্ধ্যের পর থেকেই দিদির পরিবর্তন লক্ষ্য করে রজত। কেমন যেন আড়ো-আড়ো ছাড়োছাড়ো অবস্থা। কিছু জিগ্যেস করলে এমন ভাবে উত্তর দেয় যেন এ বাড়িতে নতুন, কিছু জানে না। মা অসুস্থ। দিদিই রজতের সব দেখাশোনা করে। রজত প্রত্যেক শুক্রবার রাত্তিরে এসে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। সোনার বোতামটা বার করে দেয় লক্ষ্মী। কিন্তু গতকাল রাত্তিরে লক্ষ্মী ওটা দিতে ভুলে যায়। তাই সন্ধেবেলা রজত বলল, দিদি, আমার সোনার বোতামটা বার করে দে তো।

কি রকম অদ্ভুত চোখে চাইল লক্ষ্মী। তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

রজতের ঘুম আসছে না। তার প্রিয় দিদি, এ তার কি হল! দূরে একটা বটগাছ দেখা যায় রজতের জানলা দিয়ে। রজত রাতের অন্ধকারে ঐ গাছটার দিকে তাকিয়ে নানা রকম চিন্তা করতে লাগল। হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ। রজত সজাগ হয়ে যায় কোথায় যেন শব্দ হল। পাশেই ঘরেই দিদি থাকে। রজত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। টেবিলে রাখা ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ে। রাত বারোটা। গ্রাম তো, রাত বারোটাতই সবার মাঝরাত। রজত দেখল, দিদি ঘর থেকে কোথায় যেন যাচ্ছে, কিন্তু দিদি যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটছে। দরজা খুলে দিদি এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে। রজত কি ভেবে বালিশের নীচে থেকে জোরাল টর্চটা বার করে নিল। তারপর দিদিকে অনুসরণ করতে লাগল। কোথায় যাচ্ছে দিদি? এই তো সকালে বারবার বলছিল রজতকে—রাত্তির বেলা যেন বেরোসনি। তবে দিদি কেন বেরোচ্ছে! একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে রজত। ভাবল দেখি না দিদিকে ডেকে বারণ করে। জিগ্যেস করে কোথায় যাচ্ছে। একবার ও খুব আস্তে ডাকল। কিন্তু লক্ষ্মী শুনতে পেল না। রজত দেখল লক্ষ্মী সদর দরজা খুলে বটগাছের দিকে এগিয়ে চলেছে। থমকে দাঁড়াল রজত। লক্ষ্মী ঠিক বটগাছের তলায় এসেই এক লাফ মারল। একদম গাছের মগডালে গিয়ে বসল। একি! রজত হতচকিত হয়ে কি করবে ভেবে না পেয়ে ছুটে গেল বটগাছের নীচে, চিৎকার করে উঠল—দিদি.....দিদি.....তুই কোথায়! হঠাৎ চোখের সামনে একটা মুখ। কি বীভৎস! চুলগুলো মুখটা ঢেকে রেখেছে। মুখটা নীচে করে ঝুলে পড়েছে। ভয়ে দু'পা পেছিয়ে এল রজত। হি হি করে হেসে উঠল মূর্তিটা ; মুহূর্তের মধ্যে পেন্ডুলামের মতো দুলে ওঠে মুণ্ডুটা। চুলের মধ্যে থেকে মুখটা দেখা গেল—এ তো লক্ষ্মী। চিৎকার করে উঠল রজত—এ কে? এ কে? কে তুই দিদিকে ভর করেছিস? মুণ্ডুটা চিৎকার করে ওঠে—পালা, নয় তো মরবি, পালা—।

মুণ্ডুটা বুঝি তাকে কামড়াতে আসছে—রজত একটা বড় ইঁটের টুকরো তুলে ছুঁড়ে মারল মুণ্ডুটার দিকে। আঘাত পেয়ে মুণ্ডুটা তেড়ে এলো ওর দিকে। পালাতে গিয়ে বাড়ির দরজার কাছে পড়ে গিয়ে রজত অজ্ঞান হয়ে গেল।

পরদিন সকালে রজত দেখল সে তার ঘরে শুয়ে আছে। পাশে মা, বাবা, দিদি। দিদি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মা ওর হাতের ওপর হাতটা রেখে উদ্বিগ্ন মুখে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। রজতের খুব ক্লান্ত লাগল। তার হঠাৎ সব মনে পড়ে গেল। ধড়ফড় করে উঠে বসে লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বলল—দিদি, আমাকে ছেড়ে দে, আমি যে তোর একমাত্র ভাই।

অবাক হয়ে বলল লক্ষ্মী—তা তো বটেই। কিন্তু তুই এসব বলছিস, ভাই? ছেড়ে দেবার কথা.....ঠিক বুঝতে পারছি না তো।

নিজেকে সামলে নিয়ে বলল রজত—আচ্ছা, আমার কি হয়েছিল?

লক্ষ্মী বলল—সেটাই তো বুঝতে পারছি না আমরা। সকালবেলা বুধোর মা দুধ

দিতে এসে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে বলে—কে কোথায় আছ গো ছুটে এসো, দাদাবাবু এখানে পড়ে আছে। এ কি সর্বনাশ হল গো!

বাড়ির সবাই আমরা ছুটে গিয়ে দেখি সদর গেটের কাছে তুই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছিস। সবাই মিলে তুলে এনে ঘরে শুইয়ে কবরেজ মশাইকে খবর দিলুম। উনি বললেন, কোনো কারণে মনের ওপর চাপ পড়েছে। রাত জেগে পড়াশোনা করেছে বোধহয়। একটু রেস্টে থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

তা তুই হঠাৎ মাঝরাতে বাইরে বেরতে গেলি কেন বল তো, তোকে না কত করে বারণ করেছিলুম। কোনো স্বপ্নটপ্ন দেখেছিলি নাকি!

স্বপ্ন! কথাটা ধাক্কা দিয়ে গেল রজতকে।

স্বপ্ন! হয়তো তাই হবে—স্বপ্নই সে দেখেছিল, কিন্তু কী বাস্তব! যেন মনে হচ্ছে সব সত্যি। ওঃ, দুঃস্বপ্ন বটে একটা।

হঠাৎ রজতের চোখে পড়ল দিদির কপালে সদ্য আঘাতের চিহ্ন। জায়গাটা নীল হয়ে আছে।

রজত ছটফট করে উঠল। মনে পড়ল ইঁট ছুঁড়ে মুণ্ডুটাকে আঘাত করার দৃশ্যটা। বলল—ঐ দাগটা.....ঐ দাগটা কিসের রে?

লক্ষ্মী ব্যাপারটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, আর বলিসনি—তোকে তুলে আনার সময় দরজার শিকলটায় জোরে ধাক্কা লেগে গেল।

রজত লক্ষ্মীর সরল কথাগুলো শুনে মহা দ্বন্দ্বে পড়ে গেল। তবে কি সে সত্যিই স্বপ্ন দেখেছিল! নাকি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে হাঁটার অভ্যেস হয়েছে! কিন্তু তা যদি হত তবে মেসের লোকেদের কাছে তো আগে জানতে পারত। কি জানি। তবে এমনও তো হতে পারে, ক'দিন ধরে গ্রামে নানারকম গল্পগুজব শুনে স্বপ্নের মধ্যে এমনটা ঘটেছে। এসব ব্যাপার অবচেতন মনে ছাপ ফেলতেই পারে। মন থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলেও কিন্তু কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না। ব্যাপারটা সে আর একবার বাজিয়ে দেখবে। একটু সুস্থ হতেই ও ঠিক করল, রাত্তিরে সে আর ঘুমবে না, দিদির ওপর নজর রাখবে। কারণ এটা তো ঠিক সে নিজের চোখেই দেখেছে সন্ধে হলেই দিদি কেমন বদলে যায়।

ঠিক রাত বারোটা। রজত দেখল লক্ষ্মী বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে। চুল খোলা। হাওয়ায় উড়ছে। সোজা তাকিয়ে এগিয়ে চলেছে। কেমন যেন একটা ভাব। হঠাৎ কি হল রজতের একেবারে লক্ষ্মীর সামনে পথ আগলে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডেকে বলল—দিদি, কোথায় যাচ্ছিস?

লক্ষ্মী তাকাল রজতের দিকে। চোখ দুটো আস্তে আস্তে আগুনের গোলার মতো জ্বলতে লাগল, শোঁ শোঁ করে শব্দ হতে লাগল। একটা ঝড়ের মতো ঠান্ডা হাওয়া এক ধাক্কা মারল রজতকে। ছিটকে পড়ল রজত। তারপরই চোখ তুলে দেখল লক্ষ্মী

গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না রজত। গাছের তলায় একটা কুকুর ঘুমচ্ছিল। লক্ষ্মী মাথা নিচু করে ওর গলাটা কামড়ে ধরল। কুকুরটা ধস্তাধস্তি করতে লাগল ছাড়াবার জন্যে। তারপর কুঁইকুঁই করে আর্তনাদ করতে করতে লুটিয়ে পড়ল। রজত একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল, আর্তনাদ করে উঠল—দিদি—! লক্ষ্মী ঘুরে দাঁড়াল, হিহি করে হেসে উঠল। রজত দেখল ওর দু'কষ বেয়ে রক্ত পড়ছে। আরও ভাল করে লক্ষ্য করল রজত—না এ তো তার দিদি নয়। তাছাড়া শুধু মুণ্ডুটা রয়েছে, শরীর তো দেখা যাচ্ছে না। মুণ্ডুটা ক্রমশ এগিয়ে এলো। রজত পালাবার চেষ্টা করেও পারল না। মুণ্ডুটা ওর সামনে এসে দুলতে লাগল। রজত বাক্যহীন, স্তম্ভিত। মুণ্ডুটা বলল—এই শোন—তুই যাকে দিদি বলছিস আমি সে নই। আমি দত্তদের বাড়ির বৌ নলিনী, যাকে গাঁয়ের লোকেরা ডাইনি বলে পুড়িয়ে মেরেছে। বুঝেছিস? আমি এ গ্রামের সব ক'টাকে শেষ করব। কুকুর বেড়াল মানুষ একটাও থাকবে না। তুই যদি আমার সামনে থেকে সরে না যাস তবে তোকেও শেষ করব বুঝলি!

হঠাৎ রজতের কেমন সাহস হল। বলে ফেলল—তুমি নলিনী বৌদি? আমি তো তোমাকে চিনি গো। শুনেছিলুম বটে তুমি আগুনে পুড়ে মারা গেছ কিন্তু তোমাকে মেরেছে জানতুম না। এ তো বড় অন্যায়।

রজতের গলার স্বরে কি ছিল কে জানে। নলিনীর গলার স্বর নরম হল। বলল—ভয় পাসনি—তোর দিদির আমি কোনো ক্ষতি করব না। শুধু একটা দেহ চাই বলে ওকে ধরেছি।

—দেহ নিয়ে তুমি কি করবে বৌদি? তুমি তো এখন প্রেতাত্মা।

—হ্যাঁ। দেহ ধরে আমি ঘুরে বেড়াই। গাছের মগডালে বসে লক্ষ্য করি কে আসছে আর কে যাচ্ছে—তারপর ভালমানুষ সেজে সামনে যাই। কেউ সন্দেহ করে না। তারপর ওদের ঘাড় মটকাই।

—কি করলে তোমার শান্তি হবে বৌদি, বল। আমি তাই করব।

অট্টহাসি হাসল নলিনী। বলল— দাঁড়া, আগে গ্রামটাকে উজাড় করি, গায়ের জ্বালা মেটাই তবে তো। তুই চলে যা। আর আমাকে যদি বিরক্ত করিস তাহলে তোর দিদিরও প্রাণ যাবে বলে দিলুম।

আবার শোঁ শোঁ শব্দ হল। নলিনীকে আর দেখা গেল না।

রজত ওপর দিকে তাকিয়ে বলল—বৌদি, কথা দাও তুমি দিদির কোনো ক্ষতি করবে না, তাহলে আমি আর বিরক্ত করব না, আর কাউকে কিছু বলবও না।

দূর থেকে ভেসে এল একটা খ্যানখ্যানে স্বর—বেশ, তাই হবে।

ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। রজত ফিরে এলো ঘরে। উঁকি মেরে দেখল লক্ষ্মী শুয়ে আছে নিজের বিছানায়।

পরদিন সকালে একটু অন্যমনস্ক হয়ে বাজারের দিকে হেঁটে যাচ্ছিল রজত। হঠাৎ কে যেন ডাকল—আরে রজত না!

রজত ঘুরে দাঁড়াল। তার সামনে দাঁড়িয়ে তারই বয়সী একজন যুবক। খুব যেন চেনাচেনা লাগল। কিন্তু ঠিক মনে করতে পারল না। ছেলেটি বলল—চিনতে পারছিস না? আমি মণীশ।

ব্যস, আর বলতে হল না। রজতের ছোটবেলার খেলার সঙ্গী। মণীশের বাবা কলকাতায় চলে যাওয়ায় ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। সে কি আজকের কথা? তখন তো ওরা দুজনেই খুব ছোট। রজত হেসে বলল—তোরা বুঝি আবার গ্রামে ফিরে এসেছিস?

মণীশ বলল—ঠিক তা নয় রে। মাসখানেকের জন্যে বেড়াতে এসেছি বলতে পারিস। তা তোর কি খবর!

রজতের মুখটা হঠাৎ শুকিয়ে যায়। বলে, মণীশ, তুই জানিস দত্তবাড়ির ব্যাপার?

—জানি বৈ কি। আরে ওটা তো এখন খবর।

—কি রকম?

—জানিস না, ওদের বাড়ির বৌটাকে কয়েকজন মিলে ডাইনি বলে পুড়িয়ে মেরেছে। ভাবতে পারিস এই বিংশ শতাব্দীর যুগে! ছি ছি।

—কিন্তু কেন? কি করেছিল সে?

রজত সবটা শোনার জন্যে উৎসুক হয়ে ওঠে। মণীশ বলে—কিছু না। ভেরি সিম্পল। নলিনী বৌদি লেখাপড়া জানা মেয়ে। তার ওপর ওর বাবা ছিলেন কবিরাজ। সুতরাং ছোটবেলা থেকে নানাধরনের ব্যাপার ওর দেখা। আর সেটাই কাজে লাগাতে গিয়ে এই বিপত্তি।

—কি রকম? খুলে বল তো।

মণীশ বলল—চল তাহলে, ঐ চায়ের দোকানটায় গিয়ে বসি।

মণীশের কাছে রজত শুনল। একদিন সন্ধ্যেবেলা নলিনী ঘরে ছিল। হঠাৎ শুনল বাড়িতে কান্নাকাটির রোল পড়ে গেছে। ছুটে গেল নলিনী কি হয়েছে দেখতে। দেখল ওর ভাসুরের দু'বছরের ছেলেটার ক'দিন ধরে জ্বর চলছিল, হঠাৎ তড়কা হয়ে ঘাড় শক্ত হয়ে কাঠের মতো হয়ে গেছে। সবাই মনে করেছিল মরে গেছে। নলিনী দেখেছিল ঠিক ঐইরকম একটা ঘটনা। তার দাদুর কাছে একদিন একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে কেঁদে পড়ল। তার কোলে বছর তিনেকের একটা মেয়ে। তড়কা মতো হয়েছে। দাদু সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চাটার মাথায় ঠান্ডা জল ঢালতে লাগলেন আর বললেন—যেখান থেকে পার একটু বরফ জোগাড় কর। বরফ এলো। বরফ জল ঢালতেই বাচ্চাটা সুস্থ হয়ে উঠল।

নলিনী আর দেরি করল না। সে তাড়াতাড়ি কুঁজোর ঠান্ডা জল এনে বাচ্চাটার মাথায় ঢালতে লাগল। বাড়ির লোক বাধা দিল না। মরেই যখন গেছে আর বাধা দিয়ে কি হবে, যা করে করুক। আশ্চর্য, বরফ দেবার দরকার হল না। জল ঢালতে ঢালতে বাচ্চাটা কেঁদে উঠল। সবাই আশ্চর্য। গ্রামের লোকেরা বলাবলি করতে লাগল—এ কি ভেলকি জানে না কি? লোকে হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে অত মাথা ঘামাত না।

কিন্তু পরদিনই এমন একটা ঘটনা ঘটল যে নলিনীর বদনাম হয়ে গেল ডাইনি বলে। দত্তবাড়ির দুই শরিকের মধ্যে মুখ দেখাদেখি নেই।

নলিনীর আর এক ভাসুরপো খেলতে খেলতে পুকুরে পড়ে গেল। হৈ হৈ কাণ্ড। যখন তোলা হল দেখা গেল মৃত। যদিও মুখ দেখাদেখি নেই তবুও ওরা এসে ধরল নলিনীকে, 'তুমি তো ভেলকি জান, বাঁচিয়ে দাও।' নলিনী যত বলে, আমি ও সব কিছু জানি না। কে শোনে কার কথা।

শেষে বদনাম দিল শত্রুর ছেলেকে মেরে ও নাকি নিজের ভাসুরের ছেলেকে প্রাণ ফিরিয়ে দিল। ও একটা ডাইনি। নলিনীর স্বামীর নাম ভোলানাথ দত্ত। উনি ভোর পাঁচটায় উঠে ট্রেনে করে বর্ধমান যান চাকরি করতে আর রাত এগারোটায় ফেরেন। কিছুই খবর রাখেন না। একদিন নলিনীকে কে বা কারা যেন টানতে টানতে নিয়ে যায় মুখে কাপড় বেঁধে। তারপর গায়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারে। আশ্চর্য! গ্রামের একটা লোকও প্রতিবাদ করেনি। শুধু ভোলানাথ বাড়ি ফিরে এসে সব শুনে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—এ অন্যায়—এ অন্যায়।

পুলিশ কোনো প্রমাণ পায়নি কারা নলিনীর গায়ে আগুন দিয়েছিল।

এতদূর বলার পর মণীশ হঠাৎ প্রশ্ন করে--সে তো বেশ কিছুদিন আগের কথা। তুই হঠাৎ এতদিন পরে এসব প্রশ্ন করছিস? তুই শুনিসনি? অবাক লাগছে।

রজত বলল, শুনেছি। অতটা গুরুত্ব দিইনি।

মণীশ বলল—তবে আজ হঠাৎ গুরুত্ব দিচ্ছিস যে?

রজত একটু ভাবল। দিদিকে বাঁচাতে গেলে তার মণীশের সাহায্য চাই। সে একা কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সে যে কথা দিয়েছে নলিনীকে কাউকে কিছু বলবে না। একটু ভেবে রজত বলল—তুই জানিস গ্রামের কয়েকটা লোক ইতিমধ্যেই মারা গেছে। কেন মারা যাচ্ছে জানা যায়নি।

গম্ভীর হয়ে মণীশ বলল—শুনেছি। আমরা সবাই খুব চিন্তায় আছি। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

রজত বলল, তুই যদি কারুকে না বলিস তো ব্যাপারটা আমি তোকে বলতে পারি। কিন্তু মনে রাখিস—কারুকে বললে কিন্তু আমার জীবন সংশয় হবে।

মণীশ কৌতূহলী হয়ে বলে—আমি বলব না তুই বল। সব কিছু আমার শোনা দরকার। গ্রামটাকে তো বাঁচাতে হবে।

সব খুলে বলল রজত। মণীশ সব শুনে স্তম্ভিত হয়ে রইল। বলল--দেখ, যে করে হোক দিদিকে বাঁচাতে হবে।

রজত ওর হাত দুটো ধরে অনুনয় করে বলে—প্লিজ মণীশ, তুই আমাকে সাহায্য কর।

—নিশ্চিন্ত থাক রজত। তোর দিদি আমারও দিদি। তাছাড়া সব জেনে শুনে আর বসে থাকা যায় না।

তার আগে তুই আমাকে একবার দেখাতে পারিস?

—বেশ তো, আজ রাতটা তুই আমার বাড়িতে লুকিয়ে থাকবি। মা-দিদি-বাবা কেউ যেন টের না পায়। ঠিক বারোটায় আমরা বাড়ির পেছনে লুকিয়ে থাকব। তুই এগারোটা নাগাদ চুপিচুপি এসে আমাদের বাগানের দরজা দিয়ে বাড়ির পেছনে লুকিয়ে থাকবি। ওখান থেকে সদর দরজাটার দিকে লক্ষ্য রাখবি। আমি ঠিক সময়ে তোর সঙ্গে দেখা করব।

ঠিক বারোটার সময় একটা ভিখিরিকে দেখা গেল গাছের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করে একটা ছেঁড়া চাদর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। রজত ঠিক সময় এসে মণীশের সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল। নলিনী লক্ষ্মীকে ভর করে বাড়ির সদর পেরিয়ে বটগাছের কাছে এসে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক একটু পায়চারি করল। তারপর নিমেষের মধ্যে মুখ নামিয়ে ভিখিরিটার গলার নলিতে দাঁত বসিয়ে দিল। মিনিট পাঁচেক.....তারপর যখন উঠে দাঁড়াল—সে কি বীভৎস চেহারা! মণীশ ভয় পেয়ে কিছু বলতে গেল, রজত বুঝতে পেরে চট্ করে ওর মুখটা চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল—'চুপ—'

লক্ষ্মীকে দেখা গেলে গ্রামের পথ ধরে এগোতে।

ইশারায় ওকে অনুসরণ করতে বলে রজতও বেরিয়ে পড়ল বাড়ির পেছন থেকে। মণীশ ওর সঙ্গ নিল। গ্রামের পথ ধরে লক্ষ্মী চলেছে দত্তবাড়ির দিকে।

আজ একটা অঘটন ঘটবে মনে করল রজত। কিন্তু আটকাবে কেমন করে।

মণীশ বলল—কপালীতলায় একজন কাপালিক এসেছে। গ্রামের লোক ওর ভয়ে ওদিকে কেউ পা দেয় না। একবার যাবি তার কাছে?

রজত একটু ইতস্তত করে বলল—এত রাতে?

মণীশ বলল—রাত না হলে ওদের তো দেখা পাওয়া যায় না।

রজত রাজি হয়ে বলল—বেশ চল।

কালীমন্দিরের চাতালে বসেছিল কাপালিক।

লাল টকটকে কাপড়, গলায় মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, রক্তবর্ণ চোখ। দেখলেই ভয় হয়। সব শুনে বলল—কাল রাত্তিরে আমি যাব, তোরা আসবি। হ্যাঁ, আর একটা কথা— ওর বাবা পাশের গ্রামের কবিরাজ, বললি না? তাকে নিয়ে আয় এখানে। ও থাকবে আমাদের সঙ্গে।

রজত একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল—কিন্তু উনি কি আসতে চাইবেন?

কাপালিক অট্টহাস্য করে উঠল। সমস্ত জায়গাটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল—আসবে না মানে—আসতে ওকে হবেই। ওর মেয়ে মুক্তি পাবে আর ও আসবে না?

কাপালিকের কথা সত্যি। একে কন্যার অকালমৃত্যু তার ওপর এই রকম দুঃখজনক পরিণতির কথা শুনে কোনো বাবা চুপ করে থাকতে পারে!

পরদিন ঠিক রাত বারোটা নাগাদ ওরা চারজনে এসে দাঁড়াল বটগাছের তলায়।

কাপালিকের হাতে একটা কমণ্ডলু আর ত্রিশূল। কাপালিক ত্রিশূল দিয়ে ওদের ঘিরে একটা গন্ডি টেনে দিয়ে বলল—কেউ আর এর বাইরে এক পা যাবে না, তাহলে কিন্তু প্রাণে মরবে। তারপর কবিরাজ মশাই-এর দিকে তাকিয়ে বলল—ডাক, তোর মেয়েকে ডাক।

কবিরাজ মশাই কাঁদতে কাঁদতে বললেন—মা—নলিনী—দেখা দে মা, দেখা দে।

গাছের ওপর থেকে নলিনী বলে ওঠে—চলে যাও তোমরা। আমি কিন্তু সবক'টাকে শেষ করে দেব বলে দিচ্ছি।

কবিরাজ মশাই বলে ওঠেন—মা-রে—আমি তোর বাবা। তুই মা একি ধ্বংসের খেলায় মেতেছিস, বন্ধ কর।

—চুপ কর—যারা আমার জীবন শেষ করে দিয়েছে তাদের গ্রাম আমি উজাড় করব। তবে আমার শান্তি।

কাপালিক চিৎকার করে উঠল—লক্ষ্মীকে যদি ছেড়ে না দিস, তবে তুই কিন্তু জ্বলে পুড়ে মরবি বলে রাখলুম। এই দেখ আমার হাতে মায়ের মন্ত্রঃপূত সর্ষে এর একটা কণা তোর গায়ে লাগলে তোকে যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদতে হবে। কেউ বাঁচাতে পারবে না। ছেড়ে দে বলছি লক্ষ্মীকে। ছেড়ে দে।

কবিরাজ মশাই বললেন—আমি ওর নামে গয়ায় পিণ্ড দেব তাহলে নিশ্চয়ই সব ঠিক হয়ে যাবে।

কাপালিক চিৎকার করে বলে—না, তাতে লক্ষ্মীর ক্ষতি হবে—আগে ও লক্ষ্মীকে ছেড়ে যাক তবে।

হাতে সর্ষে নিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে কাপালিক—ফিরে যাবি, না ছুঁড়বো?

সব চুপচাপ তারপর গাছের একটা ডাল ভেঙে পড়ল, ঢিল-ইট-পাটকেল এসে পড়তে লাগল এদের ওপর। কিন্তু গন্ডির ভেতর পড়ল না।

এবার কাপালিক সত্যি করে ছুঁড়লো সর্ষের কয়েকটা দানা। বলল—তবে নে তোর শাস্তি।

চিৎকার করে উঠল নলিনী—ঠিক আছে, আমি ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি ছুঁড়ো না।

কাপালিক বলল—তুই এই গ্রাম ছেড়ে চলে যা, তোর বাবা কালই গয়ায় যাবে তোর কাজ করতে। ততোদিন কথা দে তুই আর জ্বালাবি না।

শোঁ শোঁ করে শব্দ হল। হঠাৎ লক্ষ্মীকে দেখা গেল অজ্ঞান অবস্থায় গাছের নীচে।

কাপালিক বলল—যা, তোর দিদিকে ঘরে নিয়ে যা—আর ভয় নেই।

কবিরাজমশাই চোখে হাত দিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

রজত বলল—জ্যাঠামশাই, আজ রাতটা আমার বাড়ি থেকে কাল যাবেন।

কবিরাজমশাই কোনো কথা না বলে রজতের সঙ্গে যেতে রাজি হলেন। কাপালিকের মন্ত্রঃপূত জল লক্ষ্মীর জ্ঞান ফিরিয়ে দিল।

লক্ষ্মী অবাক হয়ে চারদিক তাকিয়ে বলল—আমি এখানে কেন? আমার কি হয়েছে?

রজত বলল—দিদি, ঘরে চল, সব বলব।

পরদিন সকালে কবিরাজ মশাই চলে গেলেন। যাবার সময়ও তিনি কাঁদছিলেন বটগাছটার দিকে তাকিয়ে।

লক্ষ্মী কবিরাজ মশাইয়ের কাছে গিয়ে বলল—জ্যাঠামশাই, নলিনী নেই, কিন্তু আমি তো আছি, আমিও আপনার আর এক মেয়ে, আপনি কাঁদবেন না।

কবিরাজ মশাই লক্ষ্মীর মাথায় হাত রেখে বললেন—ঠিক বলেছিস মা। তোর শরীরেই তো নলিনী বাস করছিল। তুই তো আমার আর এক নলিনী। আমি আবার আসব মা। ভাল থাকিস।

ক'দিন পরেই খবর পাওয়া গেল—যে রাতে মণীশ আর রজত লক্ষ্মীকে দত্তবাড়ির দিকে যেতে দেখেছিল সেই রাতে কে বা কারা এসে নলিনীর সেই জ্ঞাতি খুড়শ্বশুরকে হত্যা করে গেছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড তার শরীরে কোনো আঘাত ছিল না। কিন্তু দেহ ছিল রক্তহীন।

খবরটা শুনে রজত বুঝতে পারল নলিনী তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিল এইভাবে, সে থাকলে হয়তো দত্তবাড়ির সকলেই প্রাণ হারাত।

ভূতুড়ে খেলা

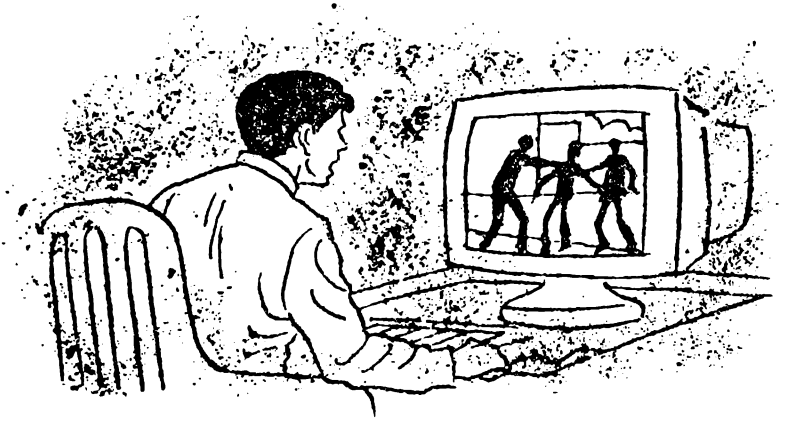

সারাদিন অফিস করে আসার পর ক্লান্ত সুহাসের ক্লান্তি দূর করার একমাত্র উপায় হল কমপিউটারে নানারকম খেলা। খাওয়া-দাওয়া করে ও খেলতে বসে রাত এগারোটায় আর ঠিক দু'ঘণ্টা অর্থাৎ একটা পর্যন্ত খেলে ঘুমোতে যায়। এটাই সুহাসের ডেলি রুটিন। সেদিনও সুহাস খেলতে বসেছে। ও প্রিয় খেলাটা খুলল। তার সবচেয়ে প্রিয় খেলা 'প্রিন্স'। পারস্যদেশের এক রূপকথা। রাজা গেছেন বিদেশে যুদ্ধ করতে, এইসময় এক ভবঘুরের সঙ্গে দেখা হল রাজকন্যার। ভবঘুরে বলল, আমি তোমাকে রাজপ্রাসাদ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করব। সে কথা শুনে সে দেশের সেনাপতি ভবঘুরেকে বন্দি করল। ভবঘুরে এবার পালাল। কিন্তু সমানে একটার পর একটা তরোয়ালধারী এসে তার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে হারিয়ে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। আসলে ভবঘুরে ছিল এক রাজপুত্র। সে সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এসে পড়ল এক বিশাল সমুদ্রের ধারে। পেছনে সৈন্য. কি করে, এমন সময় দেখা গেল সামনে এক বজরা, প্রিন্স লাফিয়ে পড়ল সেই বজরায়। বজরা তাকে পৌঁছে দিল এক দ্বীপে। সেই দ্বীপে দেখা গেল এক বিরাট দুর্গ। তার দরজা বন্ধ। সেই দরজার গায়ে একটা খুলির চিহ্ন। হাজার চেষ্টা করেও যখন সে দরজা খোলে না তখন প্রিন্স দেখল একটা নম্বর, এক থেকে ষোল পর্যন্ত লেখা। সেই নম্বরের দুই আর আট নম্বরটা মুছে দিতেই দরজা খুলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল কঙ্কালের দল। গল্পটা এইরকম ভাবে চলতে চলতে শেষে রাজকন্যা উদ্ধার হবে। প্রায় দেড়ঘণ্টার খেলা। রোজই সুহাস চালায় আর খেলে। কোনোদিন এর কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু আজ হল। খেলতে খেলতে

ভূতুড়ে খেলা

যেই ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বাজল অমনি কমপিউটারের পরিচিত দৃশ্যটি বদলে গেল। দেখা গেল একটা বিশাল বাড়ি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা—তারই একটা পেছনের জানলা দিয়ে একটা অচেনা লোক লাফিয়ে পড়ল। লোকটা মুখ ঘোরাতেই ভয়ঙ্করভাবে চমকে উঠল সুহাস। এ কে? সে কাকে দেখছে? এ যে তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু মনোজ। ওদের বাড়ির প্রায় সামনাসামনি। একটা বিরাট বাড়ি। লাহাদের বাড়ি, চারপাশে তার মোটা দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। মনোজ জানলা দিয়ে লাফাল কেন ভাবতে ভাবতে তরোয়াল হাতে কয়েকটা গুণ্ডা-প্রকৃতির লোককে দেখা গেল তরোয়াল উঁচিয়ে মনোজের দিকে তেড়ে গেল। জখম করল কিন্তু শেষ করে দিল না। ওর মুখ হাত পা বেঁধে একটা বস্তার মধ্যে পুরল। তারপর গাড়িতে করে নিয়ে চলল সোজা খিদিরপুরের দিকে। দেখা গেল একটা জাহাজ। তার মধ্যে বন্দি অবস্থায় পড়ে আছে মনোজ। জাহাজটা বিরাট সাগরের ওপর দিয়ে চলছে তো চলছে। এসে দাঁড়াল একটা দ্বীপে। কিছুটা গেলেই একটা দুর্গের মতো প্রাসাদ। ওরা মনোজকে তার ভেতর নিয়ে গেল। দরজাটাও বন্ধ হয়ে গেল। খানিক অপেক্ষা করতে গিয়ে আরও একটা ব্যাপার ঘটে গেল। সুহাস দেখল কমপিউটারের ভেতর এবার আর একটা ছবি। একটা ছেলে আর একটা জাহাজ থেকে নেমে ওদের অনুসরণ করতে করতে সেখানে পৌঁছল। ছেলেটাকে দেখে আর একবার চমকাল সুহাস। এ কে! এ তো সে নিজে!

অচেনা অজানা জায়গা। এগিয়ে চলেছে সে। সামনে একটা বিরাট প্রাসাদ। দরজাটা বন্ধ। কি করে ঢুকবে সে! চারদিকে দেখতে দেখতে দেখল একটা খুলির ছবি দরজার ঠিক ওপরে। দুটো পাল্লার মধ্যিখানে এমন করে আঁকা যে দূর থেকে মনে হয় ওটা একটাই। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করে সুহাস দেখল পাল্লা দুটো একটু আগে-পিছে আছে। তার মানে পুরোপুরি দরজাটা বন্ধ নয়। ঠেললে খুলে যেতে পারে। কিন্তু ওর শত্রুপক্ষ ওকে আক্রমণ করে। সুহাস আর ভাবতে পারল না। মনে করল যা হয় হবে। ভেবে দরজাটা জোরে জোরে ঠেলতে লাগল। একটু যেন নড়ল মনে হল। পাল্লা আবার ঠেলল গায়ের জোরে। আবার। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করার পর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে খুলে গেলে সেই ভারী পাল্লা। সুহাস নিজেকে একটু আড়াল করে রাখল। দেখল কেউ ছুটে এল না। তখন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল। কেমন যেন গুহার মতো জায়গাটা। চারদিক কুপকুপ করছে অন্ধকার। চোখটা অন্ধকারে সয়ে গেল আস্তে আস্তে। ও এগিয়ে চলল খুব সাবধানে। সে যুগের ঐতিহাসিক বাড়ি। নীচে পর পর চোরা কুঠুরি সবক'টাই ফাঁকা। শেষের ঘরে ঝুলছে একটা কঙ্কাল। বিশ্রী গন্ধ চারদিকে। সুহাস ফিরে আসছিল—হঠাৎ কে যেন ডাকল ওকে। বলল, সুহাস, আমাকে মুক্তি দে।

এ তো মনোজের গলা। সুহাস চাপা স্বরে বলে ওঠে—তুই কোথায় মনোজ?

কোনো উত্তর পায় না। তবে কি ও ভুল শুনল! কিন্তু তার মন বলছে মনোজ

এখানেই আছে। সুহাস আরও কয়েক বার মনোজের নাম করে ডাকল। সাড়া পেল না। কিন্তু একি, কমপিউটার থেকে ছবিটা বদলে যাচ্ছে কেন! আবার সেই পুরনো প্রিন্স খেলায় চলে গেছে কমপিউটার। ঘড়িতে ঢং করে রাত একটা বাজল। উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপছে সুহাস। এ সে কি সব দেখল! মনোজ তার প্রিয় বন্ধু। কিন্তু এ সব কেন দেখল! ঠিক করল, কাল সকালেই সে খবর নেবে মনোজের। কিন্তু তার আগেই মনোজের দাদা ফোন করলেন। রাত্তির তখন ঠিক একটা। মনোজের দাদা অভিজিৎ ফোন করলেন সুহাসকে। গলার স্বর কাঁপছে। বললেন, সুহাস, কি হল ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। হঠাৎ কয়েকজন গুণ্ডামতো লোক বাড়িতে এসে হামলা করল। ওরা মনোজকে চাইল। মনোজ ঘরে ছিল। গোলমাল শুনে যেই বেরিয়েছে, ওরা দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ওর দিকে তেড়ে গেল। মনোজ পালাল আমাদের খিড়কির দরজা দিয়ে। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ওরা ঠিক ধরে ফেলবে।

—ওরা মানে কারা? প্রশ্ন করল সুহাস।

অভিজিৎ বললেন—ওদের গুণ্ডা ছাড়া কি বলব। তবে এটুকু বলতে পারি ওরা পাড়ার মস্তানদের মধ্যে কেউ নয়। এদের কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তুমি তো ওর বন্ধু, ও কাদের সঙ্গে মিশছে, এরা কারা, কেন এসেছিল ওরা, খবর নাও। আজ রাত্তিরে মনোজ না ফিরলে আমি কাল সকালেই থানায় ডায়েরি করব। সুহাস বলল, ঠিক আছে, আমি দেখছি কি করা যায়। আপনি চিন্তা করবেন না।

বলল বটে অভিজিৎকে চিন্তা করবেন না। কিন্তু সারারাত ছটফট করে কাটিয়ে দিল সুহাস। কমপিউটারের এই রহস্য একটা অলৌকিক ব্যাপার তার কাছে। অভিজিৎদা যা যা বললেন—ঠিক রাত্তির বারোটার পর সুহাস কমপিউটারে তার সব আগেভাগে দেখতে পেল। কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব! তাছাড়া সে নিশ্চিত, মনোজ কখনও এমন অন্যায় কিছু করবে না যাতে তার আত্মীয়স্বজন লজ্জা পায়। তাহলে কি সে ব্যাপারটা! কাল সকালে এ ব্যাপারে খোঁজখবর করতে হবে। সারাদিন ধরে চলল থানাপুলিশ, খোঁজখবর, ডায়েরি, কিন্তু কোথায় কি! কোনো সন্ধানও পাওয়া গেল না। সুহাস ভাবে তার একমাত্র ভরসা কমপিউটার। আজ ও আবার বসবে। প্রিন্স খেলাটি খেলবে। দেখবে কমপিউটার তাকে পথ দেখায় কিনা। আজ একটু তাড়াতাড়ি বসল সে কমপিউটারে, তখন রাত এগারোটা। কিন্তু কোথায় কি। আজ তো আর কমপিউটার তাকে সাহায্য করছে না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল সুহাসের। বড় আশা করে সে বসেছিল। এটুকু কিন্তু ও খবর পেয়েছে মনোজ কোনো বাজে সঙ্গে মিশত না। তবে এরকম ঘটনাটা ঘটল কি করে! সুহাস সময় কাটাবার জন্যে কমপিউটারে তাস খেলছিল। ঢং ঢং করে বারোটা বাজল সুহাস ভাবল আর একবার চেষ্টা করে দেখি। না পেলে বন্ধ করে দিয়ে শুতে চলে যাবে। চেষ্টা করতেই আনন্দে নেচে উঠল সুহাস।

এই তো। এই তো মনোজ, কিন্তু মনোজ কি করছে! হ্যাঁ মনোজ খুব সেজেগুজে পান খেতে খেতে যাচ্ছে। মনে পড়ল সুহাসের মনোজ দিন সাতেক আগে একদিন ওকে বলছিল, ও নাকি একদিন বিয়েবাড়ি থেকে ফেরবার সময় দেখল একটা সাত-আট বছরের ছেলের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল ছেলেটির বাবা। এমন সময় একটা সাদা মারুতি ভ্যান থেকে গোটা কয়েক লোক নেমে নিমেষের মধ্যে ছেলেটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে চম্পট দেয়। ওদের মুখে রুমাল বাঁধা ছিল। ছেলেটির বাবা হকচকিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল—ধর ধর কে কোথায় আছ! আমার ছেলে নিয়ে পালাচ্ছে।

মনোজ দেখল গাড়িটা পালাচ্ছে। ও তাড়াতাড়ি নম্বরটা মুখস্থ করে নিল। W. B. 02P ৮৯৮২। তারপর ছেলেটির বাবাকে নিয়ে সোজা থানায় গেল। চারদিকে ওয়ারলেসে খবর চলে গেল। গাড়ির নম্বর হয়তো সঠিক নয়, কিন্তু এখুনি ওটা তারা বদল করতে পারবে না এমনই মনে হয়েছিল মনোজের। হলও তাই। ঘণ্টা খানেক পরে গাড়িটাকে আটক করা গেল খিদিরপুর ডকের কাছে। ভেতরে চারজন লোক ছিল। ওদের থানায় আনা হল। ডেকে পাঠানো হল মনোজকে আর ছেলেটির বাবাকে। ছেলেটিকে পেয়ে ওর বাবা আর কোনো ব্যাপারে থাকতে চাইলেন না। মনোজ কিন্তু সরে এল না। ও বলল, এদের শাস্তি পাওয়া উচিত।

শাস্তি হল। কিন্তু ওদের পেছনে বড় বড় লোকের হাত ছিল। কয়েকদিনের মধ্যে ওরা বেরিয়ে এল আর খুঁজে বেড়াতে লাগল মনোজকে।

অবশ্য মনোজকে যে খুঁজে বেড়াচ্ছে একথা মনোজ তখন বলেনি। সেটা সুহাস এখন আন্দাজ করছে। কমপিউটারের ছবিটার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল মনোজের বলা গল্পটা। পর পর সিনেমার মতো ফুটে উঠতে লাগল সব ছবি। ঢং করে রাত্তির একটা বাজল। অমনি ছবি চলে গেল। তার বদলে ফুটে উঠল প্রিন্স খেলার দৃশ্য। এতক্ষণে বুঝতে পারল সুহাস ব্যাপারটা। ওকে যারা খুঁজে বেড়াছিল তারাই সন্ধান পেয়ে ওকে ধরে নিয়ে গেছে সমুদ্র পেরিয়ে জাহাজে করে কোনো দ্বীপে। কিন্তু কোন দ্বীপ ভারতের মধ্যে সমুদ্র.....দ্বীপ....জাহাজ....যেটা খিদিরপুর থেকে ছাড়ছে। কেননা খিদিরপুরের ডকের কাছাকাছি ছেলেচোরদের ধরা গিয়েছিল। তাহলে খিদিরপুর থেকে কোন কোন জাহাজ কোন কোন দ্বীপে যায় খবর নিলে বোঝা যাবে। এছাড়া কমপিউটারের সাহায্য তো আছেই। কিন্তু খুব মুশকিল হল, এসব কোনো কথাই পুলিশকে জানানো যাবে না। ওরা কিছুই বিশ্বাস করবে না, উল্টে সন্দেহ করবে সুহাসই ওদের দলের লোক। নয় তো এত কথা জানল কি করে! সুহাসের হঠাৎ মনে হল তার মামার সঙ্গে পুলিশ কমিশনারের খুব বন্ধুত্ব আছে। দুজনে একই সঙ্গে স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে পাশ করে বেরোন। মামাকে বলে যদি কোনো সুবিধে পাওয়া যায়। পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে সেটার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে নয়। তার আরও কিছু কাজ

বাকি আছে। সুহাসের মনে হল ছেলেচুরি ছাড়াও এদের আরও অনেক ধরনের অসামাজিক কাজ আছে। কিন্তু সেগুলো কি সে জানে না। ওর একমাত্র ভরসা কমপিউটার। আর তার সময়টাও সে ধরতে পেরেছে রাত বারোটা থেকে রাত একটা। খিদিরপুরে সারাদিন ঘুরে নানারকম প্রশ্ন করতে গিয়ে দেখা গেল অনেকেই তাকে সন্দেহ করছে। একটা লোক তো তাকে অনুসরণ করে ফাঁকা জায়গায় এসে বলল—দাদা, আপনি কি পুলিশের লোক, না ডিটেকটিভ? সুহাস দেখল লোকটা সাধারণ। হয়তো পয়সাকড়ির অভাব আছে। ও এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইল না।

বলল—চলুন দাদা, একটু চা খাওয়া যাক কোথাও বসে। তবে আপনি ভয় পাবেন না। আমি পুলিশের লোকও নই, ডিটেকটিভও নই, আসলে আমার এক বন্ধু....বলতে বলতে থেমে গেল সুহাস। বলল—বাকিটা চা খেতে খেতে বলব। চলুন।

সুহাস চায়ের অর্ডার দিয়ে বলল—হ্যাঁ যা বলছিলাম, আমার এক বন্ধু মাথায় একটু ছিট আছে বুঝলেন—দু'তিন দিন আগে বলল, তার নাকি খুব জাহাজে চড়ার ইচ্ছে হচ্ছে। তা আমরা বললাম ঠিক আছে। আমরা সব আন্দামান যাব। তোকেও নিয়ে যাব।

তারপর থেকে ওকে আর খুঁজে পাচ্ছি না। তাই এখানে এসে তন্নতন্ন করে খোঁজার চেষ্টা করছি। কিন্তু পাচ্ছি না। সুহাস মুখটাকে করুণ করে বলল।

লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুহাসের দিকে। বুঝতে চেষ্টা করল সত্যি-মিথ্যে। তারপর একটু হেসে বলল—তা আপনার বন্ধু যদি জাহাজে করে হাওয়া হয়ে যায় আপনি এখানে বসে কি করবেন!

সুহাস দুম করে প্রশ্ন করে ফেলে—এখান থেকে জাহাজ কোন কোন দ্বীপে যায় বলুন তো?

লোকটা আরো অবাক হয়ে বলে ওঠে—আপনার কি ধারণা আপনার বন্ধু কোনো দ্বীপে পালিয়েছেন?

—না না পালাবে কেন? আসলে ওর তো দ্বীপ দেখার খুব শখ ছিল, তাই বলছি যদি কোনো সুযোগ পেয়ে জাহাজে উঠে বসে।

—আপনার কি ধারণা উনি 'হর্ষবর্ধনে' করে আন্দামান দ্বীপে চলে গেছেন?

—আন্দামান? লোকটার কথায় একমুহূর্তে যেন জগতটাকে আলোময় মনে হল সুহাসের। কমপিউটারে যে ছবি সে দেখেছিল সেটা আন্দামানের ছবি হওয়া আশ্চর্য নয়। তাহলে কি লোকগুলো ওকে জাহাজে করে আন্দামানে নিয়ে চলে গেছে? ওখানে কি ওদের আলাদা ঘাঁটি আছে, আলাদা ব্যবসা আছে? হাজার প্রশ্ন সুহাসের মনে। সুহাস উঠে দাঁড়িয়ে বলল—চলি ভাই। বুঝতেই পারছ মানসিক অবস্থাটা। তা তোমাকে তো বলা রইল, দেখ একটু খুঁজে। লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল সুহাসের দিকে।

বুঝতে পারল সুহাস। একটা একশো টাকার নোট বার করে লোকটার হাতে দিয়ে বলল—তোমাকেও ব্যাপারটা জানানো রইল—দেখ, যদি কোনো সন্ধান দিতে পার।

সুহাস বাড়ির দিকে রওনা হল।

সামনেই একটু এগিয়ে গেলেই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে ভেবে সুহাস পায়ে হেঁটে এগোতে লাগল। সুহাস এগোতেই লোকটা খানিকটা পেছিয়ে গেল। দেখা গেল দুটো লোককে। সুহাসের সঙ্গে কথা বলা লোকটাকে দেখে অন্য দুটো লোক বলে ওঠে—কিরে মুন্না? কি রকম বুঝলি?

মুন্না নামের লোকটা বলল—যা ভেবেছি তাই। লোকটা মনোজের বন্ধু, ওর খোঁজেই এসেছিল।

—হাপিস করে দিলি না কেন?

—নাঃ, বস্‌কে না জিগ্যেস করে করলে পরে ঝামেলায় পড়ব। এখন চল, বস্‌কে খবর দিই।

অন্য লোকটি বলল—দাঁড়া, ওকে এমনি ছেড়ে দেব না। একটু শিক্ষা দিয়ে দিই, তাহলে আর দ্বিতীয়বার জ্বালাতে আসবে না।

দূর থেকে একটা খালি ট্যাক্সি দেখে হাত বাড়ায় সুহাস, আর ঠিক সেই সময় কে যেন ধাক্কা দেয় পেছন থেকে। সুহাস পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচ্ করে একটা ব্রেক কষার বীভৎস শব্দ। সুহাসের সামনে এসে খুব জোর ট্যাক্সি ব্রেক কষে। ভাগ্য ভাল সুহাসের। আর একটু হলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে তাকে হাসপাতালে যেতে হত। হয়তো বা মরেও যেত। পেছন ফিরে আর কাউকে দেখতে পায় না সুহাস। তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয়ে যায়। সে ঠিক পথেই এগোচ্ছে। সুহাস ঠিক করে, এই সময়েই তাকে আরো কিছু জেনে নিতে হবে। ও ট্যাক্সিতে উঠে বসে। তারপর হঠাৎ ড্রাইভারকে বলে—আপনি আমাকে ঐ শিবমন্দিরের সামনে একটু নামিয়ে দিন। আমি আমার একটা দরকারী ব্যাগ ফেলে এসেছি। দয়া করে আপনি যদি একটু অপেক্ষা করেন তাতে যা চার্জ লাগে আমি সব দিয়ে দেব। ট্যাক্সি ড্রাইভার বাঙালি। রাজি হয়ে যায়। একটু এগিয়ে গিয়ে ট্যাক্সি থেকে নেমে আবার সে রওনা দেয়, যেখানে সে ছিল সে দিকে। চোখের দৃষ্টিটা একটু স্বাভাবিক হতে সুহাস এগিয়ে চলল ঘাট বরাবর। দু-একজন নাবিক একটা জায়গায় বসে জটলা করছিল। সুহাস দূর থেকে লক্ষ্য করল। এরা ওদের মতো বা ওদের দলের বলে মনে হল না। ওদের একজনকে জিগ্যেস করল সুহাস—কোনো প্রাইভেট জাহাজ কি আন্দামান যায়?

—যেতেই পারে। পারমিশানের দরকার। আপনার কি জাহাজ দরকার নাকি?

সুহাস বলল—না না আমি রিপোর্টার তো, তাই ডকের পরিবেশ—এসব খবর নিচ্ছিলাম।

ওদের মধ্যে থেকে একজন হঠাৎ বলে ফেলল—হ্যাঁ প্রাইভেট জাহাজ চালান? কত টাকার জোর থাকলে তবে পারে বলতে?

—ঠিক বলেছিস। বাঙালির হাতে পয়সা কোথায়? এসব ঐ আগরওয়ালারাই পারে। বুঝলি।

সুহাস প্রশ্ন করে—আগরওয়ালা বুঝি খুব বড়লোক?

—বড়লোক মানে? বিরাট ব্যবসাদার। কলকাতার বড়বাজারে ওর বিরাট দোকান।

সুহাস বলল—ওরা কখন যায় জানেন?

লোক দুটো বলল, দেখুন আমরা নাবিক। নিজেদের জাহাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। অত বলতে পারছি না। তবে কিছুদিন ধরে দেখেছি একটা নতুন জাহাজ খুব দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। মাঝে মাঝে সেটা উধাও হয়ে যায়। এ ব্যাপারে আপনি ডক ম্যানেজারের

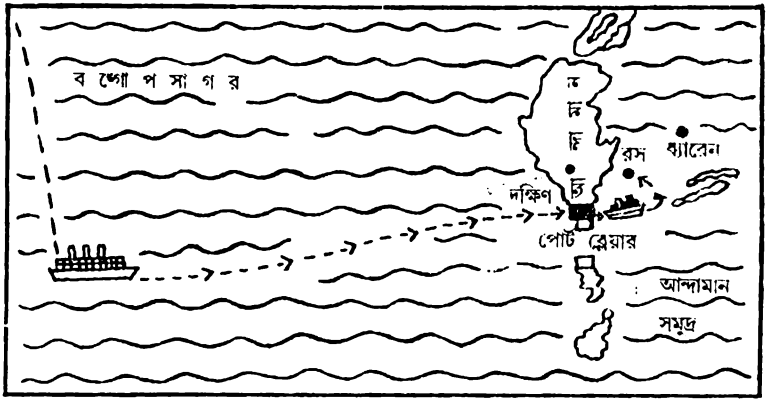

সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

এমন সময় জাহাজে একটা ভোঁ বেজে উঠল। নাবিকরা মাথায় টুপিটা পরে ছুটে চলে গেল। সুহাস দেখল রাত প্রায় দশটা। রাত বারোটার মধ্যে ওকে বাড়ি পৌঁছতেই হবে। নয়তো আজ আর কমপিউটার তাকে সাহায্য করতে পারবে না।

বাড়ি ফিরে ঠিক বারোটার সময় সুহাস কমপিউটার খুলতেই অবাক হয়ে গেল। চোখের সামনে একটা ম্যাপ। কমপিউটার তাকে একটা ম্যাপ দিয়েছে। বোঝাবার জন্যে। একটা কাগজ-কলম এনে সুহাস ম্যাপটা টুকে নেয়। বেশ খানিকটা সমুদ্র পেরিয়ে চলেছে একটা জাহাজ। পাহাড়-পর্বত ঘেরা সুন্দর একটা বন্দর। একটা ছোট তারা চিহ্ন দিয়ে লেখা পড়ল "পোর্টব্লেয়ার"। অর্থাৎ আন্দামান। এরপর একটা অ্যারো চিহ্ন দিয়ে দেখানো হল। পোর্টব্লেয়ার পার হয়ে একটা লঞ্চ চলেছে রস দ্বীপের দিকে। লঞ্চটার নাম 'হলদে পাখি' ইংরাজীতে লেখা Yellow bird আন্দামানের সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে ওটা চলেছে,

পুরো দ্বীপটা গাছপালা আর জঙ্গল, হিংস্র পশুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে। জলে কুমীর। সব পেরিয়ে লঞ্চ এসে দাঁড়াল একটা সীমানায়। ক্যামেরাটা এগিয়ে চলল। যেন কেউ হাঁটছে—হেঁটে চলেছে। দূরে একটা পুরনো দুর্গ। বিরাট উঁচু পাঁচিল। দরজাটার মাথায় কঙ্কালের ছবি। ঢং করে রাত একটা বাজল। অমনি ছবিটা চলে গেল। কমপিউটার বন্ধ করে ম্যাপটা নিয়ে নিজের ডেস্কে এসে বসল সুহাস। টেবিলল্যাম্প জ্বালল। তারপর ছকটা দেখতে লাগল। কলকাতা থেকে ১২৫৫ কি. মি. দূরে আন্দামান। ওখানে যেতে গেলে জাহাজ "হর্ষবর্ধনে" যাওয়াই ভাল। কিন্তু সে তো আর আজ বললে কাল যাওয়া যাবে না। বুকিং করতে তো প্রায় একমাস লেগে যাবে। এক হয় প্লেন। কিন্তু সেও তো দিন সাতেক লাগবে। কিন্তু মনোজের জন্যে তাকে আন্দামান যেতেই হবে। আর একবার ছকটা দেখল সুহাস।

না, সুহাস ঠিক করল প্লেনেই যাবে, তবে একটা ব্যাপার তার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। মনোজকে ওরা এত জায়গা থাকতে আন্দামান নিয়ে যাবে কেন? কিন্তু এখানে বসে হাজার ভাবলেও সুরাহা হবে না। ওকে আন্দামান গিয়ে খবর করতে হবে।

আবার ছকের দিকে তাকাল সুহাস। পোর্টব্লেয়ারে নেমে কিন্তু ওকে লঞ্চে যেতে হবে ব্যারেন ল্যান্ডের দিকে। কেন সে জানে না তবে কমপিউটার তাকে এইরকমই নির্দেশ দিচ্ছে। আর ও জানে কমপিউটারে তাকে সঠিক পথই বলে দিচ্ছে। অন্তত এতদিনে তার এই ধারণাটাই দৃঢ় হয়েছে। যদিও এটা খুবই অলৌকিক কিন্তু সে কথা ভাববার এখন সময় নেই। পরে বোঝা যাবে কি ব্যাপার। সুহাস আর সময় নষ্ট করতে চাইল না। পরদিন ভোরবেলা ও মামাকে ফোন করল। বলল—আমি তোমার সঙ্গে এখুনি এবার দেখা করতে চাই, মামা। খুব জরুরি দরকার।

সুহাসের মামা রণদেববাবু একটু চিন্তান্বিত হয়ে বলেন—কি ব্যাপার বল তো? কোনো ঝামেলা-টামেলা....

—না মামা, আমরা সব ভাল আছি, এটা সম্পূর্ণ অন্য একটা ব্যাপার, ফোনে বলা যাবে না। আমি গিয়ে সব বলব।

রণদেববাবু বললেন—বেশ চলে আয়। আমি থাকব।

সকাল ঠিক ন'টার মধ্যে সুহাস গিয়ে হাজির। রণদেববাবুর কাছে মনোজের কথা কমপিউটারের কথা—কোনো কথা লুকলো না। সুহাস ভেবেছিল মামা ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু রণদেববাবু চুপ করে শুনলেন। কোনো মন্তব্য করলেন না। বললেন—এখন তুই কি করতে চাস বল।

সুহাস বলল—মামা, তুমি তোমার বন্ধু পুলিশ কমিশনারকে বল—ওঁদের ভি আই পি কোটায় আমাকে প্লেনে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে দিতে। আর একটা কথা মামা

যা খরচ লাগে আমরা দেব। আমার সঙ্গে দুজন প্লেন ড্রেসে পুলিশ যাবে। বুঝতেই তো পারছ আমার তো রিভলবার নেই, চালাতেও জানি না। কিন্তু প্রাণের ভয়টা একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না, তাই না!

রণদেব গম্ভীর হয়ে বললেন—তোকে একা ছেড়ে দিতেই তো আমার মন চাইছে না। বয়সটা কম হলে আমি তো নিজেই চলে যেতাম, কিন্তু এই বয়সে.....।

—না না মামা। তুমি ভেবো না, আমি ঠিক ম্যানেজ করে বেরিয়ে আসব। আগে তো খবরাখবর করি তারপর ফাইনাল যা হবে, সে তো পুলিশের ব্যাপার।

—ঠিক। সাবধানে থাকিস। এখন চল। চন্দন চৌধুরীর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করি আগে।

—চন্দন চৌধুরী? প্রশ্ন করে সুহাস।

—হ্যাঁ আমার প্রিয় বন্ধু পুলিশ কমিশনার চন্দন।

রণদেববাবুর কথা ফেললেন না চন্দন চৌধুরী। সবকিছু ব্যবস্থা হয়ে গেল। রণদেবাবু চন্দনের কথামতো ডেপুটি রেসিডেন্ট কমিশনার, এ অ্যান্ড এন অ্যাডমিনিস্ট্রেশান, অকল্যান্ড প্লেসে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে এলেন। অন্যদিকে চন্দন চৌধুরী আন্দামান টুরিস্ট ইনফরমেশান সেন্টারের সঙ্গে কথা বলে সুহাসের জন্যে একটা ফেরি লঞ্চেরও ব্যবস্থা করে দিলেন যাতে পোর্টব্লেয়ারে নেমে ও ফেরি লঞ্চে ব্যারেন ল্যান্ডে যেতে পারে। আর সঙ্গে দিলেন সাধারণ পোশাকের দুজন বড় অফিসারকে।

ঠিক পাঁচদিন পর I.A.C বিমানে উঠে বসল সুহাস। ৫.৩০-এ প্লেনে উঠে দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে গেল পোর্টব্লেয়ার। চোখ জুড়ানো দৃশ্য। কি অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য! নীলসমুদ্রে ঘেরা সবুজ বনানী, পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়া নীল সাগর। চারদিকে অরণ্যের সার। প্লেন থেকে দেখতে দেখতে সুহাসের মনটা ভরে উঠল। ঠিক এই সময় যদি মনোজ তার কাছে থাকত! মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল সুহাসের। প্লেন এসে নামল দক্ষিণ আন্দামানের পূর্বে। উঁচু-নিচু পাহাড়। বলতে গেলে পাহাড়ি শহর। বাড়িঘরগুলো সব বাংলো ধরনের। চন্দন চৌধুরীর নির্দেশমতো ওরা গিয়ে দেখা করল 'হারবার মাস্টারের' সঙ্গে। ওদের পরিচয় পেয়ে উনি বললেন—আপনাদের জন্যে সব ব্যবস্থা করা আছে। আপনারা তো যাবেন রস আইল্যান্ডে?

সুহাস বলল—সেটা কোথায়? আমরা যাবই বা কি ভাবে?

হারবার মাস্টার বললেন—আপনাদের জন্যে 'ইয়োলো বার্ড' (Yellow bird) লঞ্চ রাখা আছে—ওটা সারাদিন থাকবে, আপনারা দেখে ফিরে আসবেন ওটাতেই। কেন না ওখানে থেকে ফেরার জন্যে আলাদা কিছু পাবেন না। আর একটা কথা, সঙ্গে করে খাবার-দাবার সব কিনে নিয়ে যান। ওখানে কিন্তু এসব পাবেন না। দেখবেন

কি অপূর্ব জায়গা। টুরিস্টরা তো এলেই আগে রস আইল্যান্ডের কথা জিগ্যেস করে। রস আইল্যান্ডের ইতিহাসটা নিশ্চয়ই জানেন আপনারা?

সুহাস চুপ করে ছিল। আফিসার দুজন বলে ওঠে—কি ইতিহাস একটু বলে দিন না।

হারবার মাস্টার বললেন—ছোট ছোট খাঁড়ির মধ্যে দ্বীপটা। ১৯৪১ সালে এখানে একটা সাংঘাতিক ভূমিকম্প হয়। অনেক ক্ষতিও হয়ে যায়। তার আগে এটা ছিল বৃটিশদের দপ্তর। ১৯৪১-এর ভূমিকম্পের পর রস চলে যায় জাপানের হাতে। আবার ১৯৪৫ সালে রস ফিরে আসে বৃটিশদের কাছে, কিন্তু আর দপ্তর হয় না। জায়গাটা প্রায় জনবসতিহীন। চারদিকে দেখবেন দুশো ফুট উঁচু গর্জন গাছের সার। ভাঙাচোরা বাড়ি, চার্চ, কেল্লামতো অনেক কিছু দেখতে পাবেন। যান ঘুরে আসুন।

হারবার মাস্টারের বর্ণনামতো সব দেখতে দেখতে ওরা লঞ্চে করে এগিয়ে চলল। সুহাস কিন্তু খুব অন্যমনস্ক। একটা ব্যাপারে সে কেমন যেন হয়ে গেছে। কমপিউটারে দেখেছিল পোর্টব্লেয়ার থেকে বেরিয়ে একটা লঞ্চ এগিয়ে চলেছে। সেই লঞ্চের নাম দেখেছিল Yellow bird। আশ্চর্য! আজ সে চলেছে Yellow bird-এ চড়ে রসে।

কি করে এসব হচ্ছে! এ কি ভূতুড়ে ব্যাপার! ভেবে পাচ্ছে না সুহাস। তাহলে দ্বীপে নেমে সে নিশ্চয়ই সেই ভাঙাচোরা দুর্গটাও দেখতে পাবে। যার ভেতরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে মনোজকে। বুকের মধ্যে ঝড় বইছে সুহাসের। সে কী দেখবে? এরপর কী হবে সে কিছুই বুঝতে পারছে না। ওরা যদি দলে বেশি থাকে! অবশ্য ভরসা যে সঙ্গে ওর দুজন বন্দুকধারী রয়েছে। ওদের লঞ্চটা এসে থামল যেখানে তার কিছু দূরে আরও একটা লঞ্চ দাঁড় করানো ছিল। ওরা নেমে এগিয়ে চলল। দুজন অফিসারের মধ্যে একজন মি. গাঙ্গুলি, উনি হঠাৎ বললেন—সুহাসবাবু, আপনাকে একটা খবর দেবার ছিল। স্টীমারে ওঠার আগে থানা থেকে আমাদের ফোন করেছিল।

—ফোন? কই আমি তো.....

সুহাস অবাক হল ফোনের কথা শুনে। কেননা ও যেসব জায়গা দিয়ে চলেছে সেসব জায়গা থেকে ও তো কাউকে ফোন করতে দেখেনি।

মি. গাঙ্গুলি ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। বললেন—আমরা পুলিশের লোক তো, আমাদের সঙ্গে সবসময় পাওয়ারফুল মোবাইল থাকে।

সুহাস বলল—থানা থেকে কি বলল?

মি. গাঙ্গুলি বললেন—আপনার বন্ধু ছেলেচোরদের সন্ধান দিয়ে থানায় যে ডায়েরি করেছিলেন তাতে গাড়ির যে নম্বর ছিল সেটা দেখে খিদিরপুর ডকের কাছে গাড়িটাকে ধরা হয়েছিল। সেখানে দুটো লোককে ধরাও হয়েছিল। তারপর উপরওয়ালার নির্দেশে ওদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সূত্র ধরে ওদের ওপর জাল পাতা ছিল। আপনি

রওনা হবার পর দুজন লোক ধরা পড়ে। এতদিন পর জানা যায় ওদের একটা বিরাট দল আছে। তাদের ব্যবসা হল ছেলে চুরি।

আন্দামান দ্বীপ থেকে প্রবাল চুরি আর রোজউড কাঠ—যা কিনা আন্দামানের সম্পদ—ওরা চুরি করে বিদেশে রপ্তানি করে কোটি কোটি টাকা লুটছে। আর ঐ গাড়িটা হল বিখ্যাত ব্যবসায়ী আগরওয়ালের গাড়ি। সুহাসের মনে পড়ল খিদিরপুর ডকের নাবিকদের কথা। ওদের মধ্যে একজন বলেছিল প্রাইভেট জাহাজ একমাত্র আগরওয়ালের মতো ধনী লোকই চালাতে পারে।

সুহাস জিগ্যেস করে, কিন্তু আমার বন্ধুর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি?

দ্বিতীয় অফিসার মি. পাণ্ডে উত্তর দেন—না, আপনার বন্ধুর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে ওদের ধারণা ওখানেই ওদের লুকনো কোন ঘাঁটি আছে। আর সেখানেই এদের মেন দপ্তর। তবে আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না আপনি হঠাৎ রস আইল্যান্ডে এলেন কেন?

সুহাস আসল কথাটা কাউকে বলতে পারেনি। আজও পারল না। বললে যদি ওঁরা ফিরে যেতে চান! কল্পনা বলে উড়িয়ে দেন! ও চুপ করে রইল। তারপর বলল, আমার মনে হয়েছিল ওরা এই নির্জন জনবসতিহীন জায়গাতেই ঘাঁটি করবে। চলুন না ঘুরে দেখা যাক। না পেলে আন্দামানেই অনুসন্ধান চালিয়ে যাব।

ওরা ধীর পায়ে এগোতে লাগল। ঠিক কমপিউটার ওকে যেমন যেমন দেখিয়েছিল—সব ঠিক সেরকম। ঐ খানিকটা দূরে একটা পোড়ো দুর্গ। বিশাল বিশাল উঁচু পাঁচিল, কিন্তু জায়গা জায়গায় ভাঙা। এ বোধহয় সেই ভূমিকম্পের ফল। কিন্তু সুহাসের লক্ষ্য ঐ ভাঙা দুর্গের দিকে। হ্যাঁ, এই সেই দুর্গ। ওর ভেতর ওদের ঢুকতে হবে। কে জানে কি বিপদ লুকিয়ে আছে ওখানে! এখানে ওরা ছাড়াও অন্য একটা লঞ্চে আরো লোক এসেছে। কিন্তু কই, এতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুখ তো দেখতে পেল না ওরা। তাহলে ঐ লঞ্চটা কি আগরওয়ালদের! ছেলে পাচার, প্রবাল ও কাঠচুরির জন্যে তো লঞ্চ আসা-যাওয়া করবে। এটা তো ভাবা উচিত ছিল। সুহাস মি. গাঙ্গুলি আর পাণ্ডেকে কথাটা বলতেই ওঁরা দুজনেই ওঁদের পকেটের মধ্যে হাত ঢোকালেন। সুহাস বুঝতে পারল ওঁদের আঙুল রিভলভারের হ্যান্ডেলের ওপর চেপে বসেছে। সুহাসরা তিনজন পাঁচিলের ধারে এসে দাঁড়াল। বিশাল গেট বন্ধ। কী করে খুলবে গেটটা! একটু জোরে ঠেলতেই একটু নড়ল দরজাটা। মি. পাণ্ডে ফিসফিস করে বললেন, তার মানে খোলা আছে। ভাগ্য ভাল ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ নেই। আসুন, আমরা তিনজনে একসঙ্গে ঠেলি। জোরে চাপ দিতেই খুলে গেল দরজা। তবে পুরোটা নয়, একজন মানুষ যাবার মতো সরু হয়ে খুলল—ভেতরটা কুপকুপ করছে অন্ধকার। দিনের বেলা এত অন্ধকার ভাবা যায় না। দরজা দিয়ে যা আলো ঢুকছে তা ভেতর অব্দি পৌঁছচ্ছে না। ওরা পা টিপে

টিপে এগোতে লাগল। হঠাৎ সুহাস দাঁড়িয়ে গেল। কে যেন তার কানে কানে এসে বলে গেল—সাবধান সুহাস, ওরা পাশের ঘরে আছে।

সুহাস পরিষ্কার শুনেছে—এটা মনোজের গলা। কিন্তু কোথায়? কেউ তো কাছে-পিঠে নেই। তবে এটাও কি তার মনের ভুল? সুহাসকে বিভ্রান্ত দেখে ওঁরা ইশারা করে জিগ্যেস করলেন—কি ব্যাপার?

সুহাস ফিসফিস করে বলল—ওরা পাশের ঘরে, সাবধান।

সুহাস উঁকি মেরে দেখল—চার-পাঁচজন লোক পার্সেল তৈরি করছে। কিন্তু মনোজ তো নেই। আবার কানের কাছে মনোজের গলা। মনোজ বলল—সুহাস, বাঁ দিকের সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যা।

সুহাস দেখল বাঁ দিকে একটা সিঁড়ি। বহুদিনের ভাঙাচোরা। ওরা সাবধানে নীচে নামতেই একটা প্রচণ্ড পচা গন্ধ নাকে এসে লাগল। সামনে যে ঘরটা তার মধ্যে দুটো পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চা ছেলে মুখবাঁধা হাতপা-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে। ওদের দেখে ওরা গোঁ গোঁ করে শব্দ করে ছটফট করে উঠল। ঠোঁটে আঙুল রেখে ওদের চুপ করতে বলে ওরা ওদের কাছে এগিয়ে গেল। ওদের বাঁধন খুলে দিল কিন্তু মুখটা খুলল না পাছে চেঁচামেচি করে গণ্ডগোল করে ফেলে।

আবার মনোজের গলা—আমাকে বাড়ির পেছনে একটা ঢিপির নীচে পাবি। ওরা আমাকে মেরে পুঁতে রেখেছে। তুই ছেলেদের উদ্ধার করে পরে আমার শরীরটাকে বের করে সৎকার করিস। আমার বড্ড কষ্ট রে।

পাণ্ডে তাড়া দেন—আপনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে কেন, চলুন ওদের ধরা যাক।

সুহাস বলল—আমি বাচ্চাদের নিয়ে লঞ্চে ফিরে যাচ্ছি। আপনারা ওদের ব্যবস্থা করুন।

পাণ্ডে আর গাঙ্গুলির সাহায্যে ওরা আবার ওপরে উঠে এলো বাচ্চাদের নিয়ে। সুহাস বুঝল নীচে আরো কোনো মড়া পচছে হয়তো। মাথা ঘামাল না। ওদের এখন সামনে খুব বড় দায়িত্ব আছে। প্রমাণ সমেত ওদের ধরিয়ে দিতে হবে আর মনোজের সৎকার। সুহাসের চোখে জল আসছিল। তার বড় প্রিয় বন্ধু মনোজ। লঞ্চে ফিরে এলো সুহাস। অপেক্ষা করতে লাগল ওদের জন্যে। হঠাৎ দেখল হেলিকপ্টারে একদল পুলিশ এসে পড়ল ঠিক দুর্গের সামনে, নামল বলে ওর মনে হল। একটা বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুহাস, মনোজের মৃত্যুর কিছুটা প্রতিশোধ তাহলে সে নিতে পারল। কিন্তু কমপিউটার তাকে এভাবে সাহায্য করল কেন? ভাবতে গিয়ে একটা আলো দেখতে পেল সুহাস। ঠিক তো। এদিকটা তো সে আগে ভাবেনি। ওরা দুজনে এম. এসসি পড়ার সময় জয়েন্ট নামে কমপিউটারটা কিনেছিল কনসেশন রেট পাবে বলে। আর

দিনের পর দিন ওরা একসঙ্গেই সব কাজ করেছে কমপিউটারে। ওর ভেতরে অফিস ফাইলে মনোজ আর সুহাস দুটো নামেরই ফাইল রয়েছে।

মনোজ হয়তো মৃত্যুর অগে ওর অফিসে ঘটনাটা নোট করে রেখেছিল। মানুষ বিশ্বাসঘাতক হতে পারে কিন্তু কমপিউটার তার প্রভুর জন্যে যা করল তা কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না। কতবার সুহাস বলেছে, মনোজ আমার বাড়িতে কমপিউটার রয়েছে বলে তোর কত অসুবিধে হয় বল, তো। মনোজ বলেছে, শোন, আমার বাড়িতে জায়গা নেই তুই তো জানিস। তাছাড়া তোর কাছে থাকলে তো আমার কাছেই থাকার মতো তাই না?

আজ মনে করছে সুহাস। ভাগ্যিস মনোজ কমপিউটার ওর কাছে রেখেছিল নয়তো কোনোদিন মনোজের সন্ধান পাওয়া যেত না।

মনোজের জামাকাপড় শনাক্ত করে দেখা গেল ঢিপির নীচে পচাগলা মৃতদেহটা মনোজেরই।

বাড়ি ফিরে আবার ঠিক রাত বারোটার সময় প্রিন্স খেলাটা খুলল সুহাস। না কোথাও কিছু নেই। হঠাৎ কি মনে হতে মনোজের ফাইলটা ওপন করল সুহাস। আর সঙ্গে সঙ্গে সব রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। ফাইলে মনোজ সেদিনের সেই ঘটনার কথা লেখার পর লিখেছে—

"আমাকে ওরা ছেড়ে দেবে না। হয়তো খুন করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেবে। আমার আত্মীয়স্বজন মনে করবে হয়তো মনোজ খুন হবার ভয়ে বিদেশে পালিয়েছে। কিন্তু আমি কারুকে ভয় পাই না। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি আমার জীবন যায় যাক। শুধু আমি যদি কোনোদিন হারিয়ে যাই—জীবিত অথবা মৃত যে অবস্থাতেই হোক না কেন কেউ যেন আমাকে খুঁজে বার করে প্রমাণ করে আমি ভীতু নই। আমি সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পাই না।"

সুহাস একচোখ জল নিয়ে মনে মনে বলল—'ধন্যবাদ কমপিউটার।'

কিউরিও ঘর

বিরাট ব্যবসায়ী কোটিপতি নরেন শীলের একমাত্র ছেলে নবরূপ শীল। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ায় নবরূপের একেবারেই মন নেই। ও বুঝতে পেরেছিল তার বাবার যা টাকাপয়সা তাতে তাকে আর কষ্ট করে পড়াশোনা করে চাকরি করে খেতে হবে না। আর ব্যবসা! এর জন্যে তো আর পড়াশোনা লাগে না, লাগে বুদ্ধি। সেটা ওর যথেষ্ট আছে বলে তার ধারণা হয়েছিল। মা অল্পবয়সেই চলে গেছেন। আর ব্যবসার খাতিরে বাবা নরেন শীলকে থাকতে হয় বেশির ভাগ সময় বাইরে। সুতরাং বয়ে যাওয়া ছেলের দিকে তাঁর নজর দেবারও সময় ছিল না। ছোটবেলা থেকেই নিজের বন্ধু-বান্ধব আড্ডা নিয়ে কাটিয়ে দিত নবরূপ। অবশ্য লেখাপড়া যে একদম করেনি তা নয়। স্কুল ফাইনালটা কোনোরকমে পেরিয়েছিল। নরেন শীলও হয়তো মনে করতেন ব্যবসায়ীর ছেলে ব্যবসায়ী হবে সেটই তো কাম্য।

আর সেইজন্যেই হয়তো নবরূপ যখন বলল সে একটা ঘর প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়ে সাজাবে তখন হয়তো নরেন শীল ভেবেছিলেন আইডিয়াটা মন্দ নয়। ভবিষ্যতে কিউরিও জিনিসের দাম দেশের বাজারে বা আন্তর্জাতিক বাজারে দশগুণ লাভ এনে দেবে। সুতরাং মোটামোটা টাকা দিয়ে ছেলের এই কিউরিও করার শখটাকে তিনি জিইয়ে রাখলেন। নবরূপেরও এটা একটা নেশার মতো হয়ে গেল। পার্ক স্ট্রীটের দোকানগুলোতে তাকে প্রায় দেখা যেতে লাগল, কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল নবরূপের কিউরিও ঘর রীতিমতো ভরে উঠেছে। নবরূপের বিশাল অট্টালিকা। ওর নিজেরই তিনখানা বড় বড় ঘর। তারই মধ্যে যেটা বারান্দার এককোণের ঘর সেটাই তার কিউরিও ঘর। যত লোকজন আসে নিজের হাতে কিউরিও ঘর খুলে সবাইকে দেখায়। কি নেই তাতে! কতরকম পাথর, বিভিন্ন রকমের কলম, নানান দেশের টাকাপয়সা, বিভিন্ন দেশের অদ্ভুত অদ্ভুত সব মূর্তি, কাটগ্লাসের নানারকম জিনিসপত্র, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন নিদর্শন, বেশ ভালই সংগ্রহ করেছে নবরূপ। কিন্তু এততেও তার মন ভরেনি। সে রোজ বিকেলে বেরিয়ে দোকানে দোকানে ঘোরে। কয়েকটা দোকানের সঙ্গে ওর বন্ধুত্বও হয় গেছে। বিশেষ করে স্যামুয়েল সাহেবের সঙ্গে। সেদিনও নবরূপ তার নিজের ফিয়েটে করে হাজির হল স্যামুয়েলের দোকানে। স্যামুয়েল সেই মুহূর্তে দোকানে ছিলেন না। নবরূপ দেখল ঘরের এককোণে একটা ছোট প্যাকিং বাক্স, তখনও খোলা হয়নি। নবরূপ দোকানের কর্মচারীকে ডেকে জিগ্যেস করল—ওটা কি? কি আছে ওতে?

—জানি না স্যার। মালটা ঘণ্টাখানেক আগে এসেছে। একজন বিদেশী ওটা নিয়ে আসার পর, স্যামুয়েল সাহেব ওকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেলেন। আর বলে গেলেন উনি না ফেরা পর্যন্ত যেন পার্সেলটা খোলা না হয়। তাই বুঝতে পারছি না ওতে কি আছে।

দোকানের কর্মচারীরা সকলেই নবরূপকে চেনে। নবরূপ তাই বলল—উনি এলে বোলো আমি এলে যেন জিনিসটা খোলা হয়।

লোকটা বলল—কিন্তু সাহেব যদি.....

নবরূপ একটু হেসে ওকে থামিয়ে বলল—তুমি আমার নাম করবে।

বলেই লোকটার হাতে একটা একশো টাকার নোট গুঁজে দিল।

লোকটা আর কোনো কথা না বলে সরে গেল। ফিরে এসে স্যামুয়েল সাহেব যখন শুনলেন নবরূপ ওটা খুলতে বারণ করে গেছে—তখন স্যামুয়েল এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। কারণ বহুদিন ধরেই তো তিনি নবরূপকে দেখছেন।

বড়লোকের ছেলে। যা বলবে তাই করবে। তাছাড়া স্যামুয়েল খুব চালাক ব্যবসায়ী।

উনি ব্যবসা করতে জানেন। তাছাড়া খবর আছে ঐ বাক্সে যা আছে তার দাম কমপক্ষে চার-পাঁচ লাখ টাকা। এত টাকার জিনিস কেনার মতো খদ্দের হাতে গোনা যায়। নবরূপ ঐ খদ্দেরদের মধ্যে একজন। স্যামুয়েল প্রথমটা এ মাল রাখতে রাজিই হননি। কিন্তু যখন শুনলেন মালটা বিক্রি না হলে ওরা ফেরৎ নিয়ে যাবে তখন রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু বলে দিলেন—সাতদিনের মধ্যে না বিক্রি হলে তোমরা নিয়ে যাবে।

ওরা তাতে রাজি হওয়ায় স্যামুয়েলও আর আপত্তি করেননি। এখন নবরূপের যদি নজর পড়ে যায় তো ক্ষতি কি। ত্রিশ পার্সেন্ট কমিশন পেলে তো তাঁর মন্দ লাভ হবে না। আর দরাদরি তো হবেই সুতরাং স্যামুয়েল ঠিক করলেন উনি দামটা ছ'লাখে রাখবেন। তারপর যদি কমে সে আর কত কমবে।

নবরূপের জন্যে বসে বসে যখন রাত দশটা বাজতে চলেছে, স্যামুয়েল মনে করছেন এবার দোকান বন্ধ করবেন, ঠিক সেই সময় নবরূপের গাড়িটা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে নেমে লজ্জিত নবরূপ বলল—সরি স্যার, একটু দেরি হয়ে গেল। তা পার্সেলে কি এসেছে বলুন তো। ওটা আবার কোথাও পাচার করে দেননি তো।

স্যামুয়েল উল্টো চাপ পেয়ে থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন—সে কি স্যার, আপনি বলে গেছেন বলে আমি পার্সেল খোলার ঝুঁকিটাও নিইনি। এই কে আছিস! পার্সেলটা খুলে আগে ওনাকে দেখা।

ঘটা করে পার্সেল খোলা হল। তার ভেতর আবার একটা প্যাকিং। এত যত্ন করে যখন নিশ্চয়ই খুব দামী কিছু হবে। নবরূপ হুমড়ি খেয়ে প্যাকিং বাক্সর ওপর থেকে লক্ষ্য করছিল আর ছটফট করছিল। অবশেষে জিনিসটা দেখা গেল। ছোট্ট একটা সোনার সাপ, তার মাথায় আটকানো একটা নীলকান্ত মণি। কি অসাধারণ তার দ্যুতি। পাগল হয়ে গেল নবরূপ। এ জিনিস সে কিছুতেই হাতছাড়া করতে পারবে না। হঠাৎ তার চোখ পড়ল বাক্সর ভেতর আর একটা কি যেন দেখা যাচ্ছে। স্যামুয়েলের লক্ষ্য ছিল সেদিকে। ও হাতে করে তুলতেই দেখা গেল বহুপুরনো কাগজ। তখনকার দিনে যাকে বলা হত প্যাপাইরাস রীড, নলখাগড়া থেকে তৈরি কাগজ তার ওপর অদ্ভুত ধরনের কালি দিয়ে লেখা কোনো পুঁথি। এই কালি তৈরি হত জলগঁদের আঠা আর রান্নাঘরের ঝুল মিশিয়ে। নবরূপ পুঁথিটা দেখে বলল—ওটা কি কোনো ম্যাপ?

স্যামুয়েল বললেন, মনে হচ্ছে কোনো পুরনো দলিল। হয়তো এই সাপটার সম্পর্কে কিছু লেখা আছে।

—ওটাও আমার চাই। বলল নবরূপ।

স্যামুয়েল বললেন—কিন্তু স্যার আপনি তো মিশরের ভাষাও জানেন না, লিখতে পড়তেও জানেন না—এ নিয়ে আপনার কি লাভ!

নবরূপ বিরক্ত হয়ে বলল—আর ওটা আমি না নিলে আপনার কি লাভ পরিষ্কার করে বলুন তো দেখি।

স্যামুয়েল হেসে বললেন—আমার কোনো লাভ নেই। তবে অবশ্য ম্যাথিউসের লাভ হতে পারে।

—ম্যাথিউস আবার কে? অবাক হয়ে প্রশ্ন করল নবরূপ।

স্যামুয়েল বললেন—খ্যাতিসম্পন্ন বিখ্যাত মানুষ। তারপর একটু চাপা গলায় বললেন—যে আমাকে এসব জোগাড় দেয়। ম্যাথিউস একজন ইন্টারন্যাশান্যাল স্মাগলিং দলের লিডার। হ্যাঁ, আর একটা কথা। লোকটা টাকাপয়সার ব্যাপারে একেবারে পিশাচ।

নবরূপ আর ওসব ব্যাপারে মাথা ঘামাতে রাজি নয়—যা টাকা নেয় নিক কিন্তু ঐ পুঁথির মানেটা কি? আপনি দয়া করে ম্যাথিউস সাহেবের সঙ্গে একটু পরামর্শ করার সুযোগ করে দিন আমাকে। আমাকে জানতেই হবে—ওটা—কি? ওটা কি দামী না সাধারণ? আমি জানতে চাই। আর আমার কিউরিও ঘরের মধ্যে হবে ওর সসম্মানে প্রতিষ্ঠা।

স্যামুয়েল বললেন—ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে তো বুঝলাম। ওর কি কোনো আসার ঠিক আছে? সাতটা—আটটা—নটা—দশটা কোনো ঠিক নেই।

নবরূপ বলল—যত রাত হোক আমি থাকবই। জানতে আমাকে হবেই।

রাত দশটার পর এসে হাজির হলেন ম্যাথিউস। স্যামুয়েল একটা আলাদা ঘরে ওদের নিয়ে গিয়ে বসালেন। বললেন—নির্ঘাৎ জমে যাবেন আপনারা। কথা বলুন। আমি বরং চা পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদের জন্যে।

নবরূপ বলল, মিঃ ম্যাথিউস, বাক্সর মধ্যে যে পাণ্ডুলিপি দেখলাম ওটাও আমার চাই, এবার বলুন সাপ আর পাণ্ডুলিপি সব নিয়ে কত দেব।

ম্যাথিউস বললেন—আপনি ওটা নিয়ে কি করবেন? আপনি তো ওই ভাষা পড়তেও পারবেন না, বুঝতেও পারবেন না।

নবরূপ বলল—কিন্তু আমি ওটা পড়ার জন্যে ঐ ভাষা শিখে নেব অথবা কোনো মিশরীয়কে দিয়ে ট্রানস্লেট করিয়ে দেব। মোটকথা ওটা আমার চাই। আপনার আপত্তি কেন? আপনি তো টাকা পাবেন।

ম্যাথিউস বললেন—দেখুন মিঃ শীল। টাকাটা এখানে সব নয়। টাকার সঙ্গে এর কোনো তুলনাই হয় না। এটা ছিল কোথায় জানেন? মেন পিরামিডের মধ্যে একটা

মেন-কু-রে-এর নীচে। আমাদের ধারণা এই পুঁথিতে আরও অনেক তথ্য আমরা পাওয়ার আশা করছি, এটা আপনার কোনো কাজে লাগবে না কিন্তু আমাদের কাজে লাগবে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন—আমাদের একটা বিরাট দল আছে।

—হ্যাঁ জানি। কিন্তু আপনি জানেন না। ছোটবেলা থেকে পুরনো জিনিস সংগ্রহ করে ঘর সাজানো আমার নেশা। তাই আমিও আপনাদের মতো আরও অনেক কিছুর সন্ধান চাই। এমন অমূল্য সম্পদ আমি আরও চাই।

ম্যাথিউস বললেন—বেশ তো, সেজন্যে তো আমরা আছি।

নবরূপ বলল—দেখুন, টাকার আমার অভাব নেই। আমি নিজে মিশরে যেতে চাই। পিরামিড দেখতে চাই। শুধু দেখা নয়, ওর নীচে গিয়ে অমূল্য সম্পদগুলো দেখতে চাই।

ম্যাথিউস বললেন—আপনি একা এটা করবেন ভাবছেন?

নবরূপ একটু চুপ করে থেকে বলল—সেটা সম্ভব নয় জানি, তাই তো পুঁথিটা আমার কাছে রাখতে চাই। কারণ, এই পুঁথির লোভে অনেকেই আপনার মতো এগিয়ে আসবে আমার কাছে। ঐ পুঁথির আকর্ষণে।

ম্যাথিউস হাসলেন। বললেন—অবশ্য আপনার বুদ্ধিটা মোটেই খারাপ নয়। আমি ভাবতে পারিনি ঐ পুঁথির জন্যে আপনি এত লালায়িত হবেন। তাহলে প্রথমেই সরিয়ে ফেলতাম। শুনুন মিঃ শীল—আপনি যদি সত্যি মিশর যেতে চান, সব নিজের চোখে দেখতে চান আমি আপনাকে সাহায্য কর। কিন্তু তার বদলে একটা শর্ত আছে। সেটা যদি মেনে নেন তো আপনারও লাভ আমারও লাভ।

নবরূপ একটু ভেবে বলল—শর্তটা কি?

ম্যাথিউস বললেন, শুনুন মিঃ শীল, আপনার তো মিশর দেখার খুব ইচ্ছে। আমি আপনাকে নিয়ে যাব মিশরের রাজধানী কায়রোর কাছে গিজেতে। গিজেতেই রয়েছে পাঁচ হাজার বছরের পুরোনো সব পিরামিড। সেই সময় মিশরের রাজাদের উপাধি দেওয়া হত 'ফারাও' বা 'ফেরো'। তৃতীয় রাজবংশের প্রথম ফেরো ছিলেন যোসেব। সবুজ মাঠের শেষে যেখান থেকে মরুভূমির শুরু হয়েছে সেখানেই পিরামিড তৈরি হয়েছিল। এই যোসেবের পিরামিড ছিল প্রথম। তাই আশা করা হয় এই পিরামিডের তলায় অসংখ্য জিনিস আছে। সেসব জিনিস যোসেব ব্যবহার করতেন। একটা পিরামিড আমাদের বড়লোক করে দেবে।

নবরূপ ম্যাথিউসকে থামিয়ে বলে—তাহলে এতদিন করেননি কেন?

ম্যাথিউস নবরূপের কথাটা লুফে নিয়ে বলে ওঠেন—সেই কথাই তো বলতে যাচ্ছি।

বাবা অবশ্য অনেকবার বলেছেন একটা ওয়াচ-ডগ রাখতে। নবরূপই রাখেনি ইচ্ছে করে। ওসব ঝামেলা তার ভাল লাগে না। সাপটা নিয়ে কারেন্ট বন্ধ করে কিউরিও রুমে ঢোকে নবরূপ। একদিকে দেওয়ালের সেল্ফের ওপর মাঝারি সাইজের সব জিনিস সাজানো আছে। নবরূপ ঐ সেল্ফেই সাপটা রাখল। হঠাৎ মনে হল সাপের মাথায় মণির দ্যুতিতে চারদিক যেন আলোয় আলো হয়ে গেল। নবরূপ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। দেখল সাপের চোখ দুটো কি অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলছে। মাথার মণিটা থেকে কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও হলুদ আভা বেরচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে একটা পরম তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল নবরূপ। আর চোখ দুটো কি চুনির নাকি কে জানে। অত লাল অত উজ্জ্বল। সাপটার কেমন যেন সম্মোহনী দৃষ্টি। নবরূপ কিছুতেই তার জায়গা থেকে নড়তে পারছে না। মনের জোর এনে ও চোখটাকে ঘুরিয়ে নিল দরজার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও ঘুরে গেল। স্থির হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর নবরূপ টলতে টলতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ঘরের দরজা বন্ধ করে ইলেকট্রিক কারেন্ট চালিয়ে চলে গেল ঘরে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমোতে যেতে দেরি হয় নবরূপের। আজও রাত তখন বারোটা। নবরূপ বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর একটা খসখস খুটখাট শব্দে ঘুম ভেঙে গেল নবরূপের। তাড়াতাড়ি ঘরের আলো জ্বালিয়ে ও ছুটে গেল পার্টিশানের ওপাশে। না, দরজাও বন্ধ, কারেন্টও চালু—তবে শব্দটা এল কোথা থেকে? অনেক অনুসন্ধান করেও ও কিছু পেল না। ঘুমও পেয়ে গিয়েছিল। নবরূপ শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম সব গেল কোথায়! বড় বড় চোখ করে নবরূপ ভাবতে লাগল সাপের কথা। অত দামী জিনিস তার কিউরিও রুমে একটাও নেই। তাই হয়তো মনে মনে ভয় পাচ্ছে যদি কেউ নিয়ে নেয়। হয়তো বা মনের অবচেতন কোণে ভয়ও ছিল তাই ঘুম আসছে না, আসছে চিন্তা। আবার ঘুমিয়ে পড়ল নবরূপ। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল জানে না। কি একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে ঘুম ভেঙে গেল তার। ওর মনে হল কেউ একজন ঘরে ঢুকেছে। পর্দার ওপাশটা যেন নড়ে উঠল। তাহলে কি তার ভয়টাই সত্যি হল! ঘরের বড় আলো জ্বেলে, ঘরের কোণে রাখা একটা লাঠি হাতে নিয়ে সব জায়গায় ঠুকে ঠুকে দেখল নবরূপ। কই, কোথাও তো কিছু নেই। শুধু বেডল্যাম্পটা জ্বালিয়ে নবরূপ শুয়ে পড়ল। সামনের দিকে তাকাতেই দেখল সেই আধো অন্ধকারে একটা মস্ত বড় সাপ তার পায়ের কাছে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। নবরূপ একটু নড়লেই বোধ হয় কালছোবল দেবে। নবরূপ দিকবিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে বেডসাইড টেবিলের ওপর থেকে ভারী অ্যালার্ম ক্লকটা ছুঁড়ে মারল সাপের দিকে। ঘড়িটা ঝনঝন করে ভেঙে

পড়ল। সাপটার কিছু হল না। কিন্তু নবরূপ পরিষ্কার দেখেছে ঘড়িটা সাপের গায়ে গিয়ে লেগেছে কিন্তু যেন মনে হল সাপের শরীরের ভেতর দিয়ে ওটা বেরিয়ে গেল। ঠিক যেন ছায়ার মতো। সাপটা কিন্তু তাকে ছোবল মারল না। অথচ ইচ্ছে করলেই ঘড়ি ছোঁড়ার আগেই সে ছোবল মারতে পারত। সাপটা তার চোখের সামনে আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। দেওয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে ভোর পাঁচটা বাজল। নবরূপ বিছানা থেকে উঠে ঘরের আলো জ্বেলে তন্নতন্ন করে সব খুঁজতে লাগল। নাঃ, সাপকে খুঁজে পাওয়া কি অত সোজা! কিন্তু এ তো যে সে সাপ নয়—সে পরিষ্কার দেখেছে সাপের মাথার মণিটা জ্বলজ্বল করছে। আর ঐ চোখ! টকটকে লাল চোখ, সেও কি মিথ্যে! মনে পড়ল ম্যাথিউসের কথা। এগুলো সবক'টাই অভিশপ্ত। নবরূপ এসব বিশ্বাস করে না। সে এযুগের ছেলে। ও জানে সাপটাকে নিয়ে এত চিন্তার করার ফলে সে চোখের সামনে সাপটা দেখল। নয়তো সাপটা জ্যান্ত হয়ে ওর শোবার ঘরে চলে আসবে একথা এই বিংশ শতাব্দীতে কেউ বিশ্বাস করবে না। এ আর কিছুই নয়, হ্যালুসিনেশন। মনের ছবিটাকে যাতে সত্যি বলে মনে হয়। মনের দুর্বলতা তাকে বদলাতেই হবে। আসলে ম্যাথিউসের কথাগুলো তাকে ভেতর ভেতর দুর্বল করে দিচ্ছিল বোধহয়। ওসব কুসংস্কার সে মানে না। নবরূপ ঠিক করল মিশর তাকে যেতেই হবে। এমন সুযোগ সে আর জীবনে পাবে না। তবে একটা ব্যাপার। বাবাকে সে তার মিশর যাওয়ার আসল উদ্দেশ্যের কথা কখনই বলবে না। কেবল বলবে সে মিশরে যাবে কিছু দুষ্প্রাপ্য জিনিস কিনে আনার জন্যে। তার ব্যবসায়ী বাবা এতে খুশিই হবে। এ ব্যাপারে নবরূপ একেবারে নিশ্চিত।

চুপচাপ শুয়ে ভবিষ্যতের প্ল্যান করছিল নবরূপ। মনে হল একবার কিউরিও ঘরে যাবার দরকার। কেন জানি না, তখন থেকে মনটা খচখচ করছে। যদিও ও এসব বিশ্বাস করে না। কিন্তু তবু মনে হচ্ছে একবার সাপটা দেখে আসে। নাঃ, আর বসে থাকতে পারল না, কিউরিও ঘরের দিকে এগিয়ে চলল। কিউরিও ঘরের চাবি আর সুইচ লুকনো থাকত পাশের দেওয়ালের মধ্যে খাপ করা ঢাকা দেওয়া একটা লুকনো গর্তে। বাইরে থেকে দেখে দেওয়াল বলেই মনে হয়. কিছু বোঝা যায় না। কারেন্ট বন্ধ করে কিউরিও ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল নবরূপ। সোজা এসে দাঁড়াল সেই সাপটার সামনে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর চোখ দুটো জ্বলে উঠল। সাপের মাথার মণিটার এককোণে একটা সরু ফাটার দাগ দেখা যাচ্ছে না! এত সূক্ষ্ম যে খালি চোখে বোঝা যায় না। টেবিলের ড্রয়ারে ম্যাগনিফাইং-গ্লাস ছিল। নবরূপ সেটা বার করে তার মধ্যে দিয়ে দেখল—সে ঠিকই দেখেছে একটা সরু দাগ, কিন্তু

এটা তো ছিল না, হল কি করে? তবে কি সেদিন ওর ঘরে টেবিলক্লকের ধাক্কায়....না না এ সে কি ভাবছে! সে কি ক্রমশ কুসংস্কারগ্রস্ত হয়ে পড়ছে নাকি! তাহলে এটা কি করে হল! নররূপ নিজের মনেই বলে, হয়তো ছিল আগে থেকেই ওর চোখে পড়েনি। সে যাই হোক মিশরে সে যাবেই। কোনো রকম ভাবেই কোনো কিছু বা কেউ তাকে আটকাতে পারবে না।

ম্যাথিউস করিৎকর্মা লোক। সাতদিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। নবরূপ বলল—মিঃ ম্যাথিউস, আমার একটা অনুরোধ আছে।

—বেশ তো বলুন। ম্যাথিউস বললেন।

নবরূপ বলল—দেখুন, মিশর যখন যাচ্ছি—আমার ইচ্ছে মিশরের সবটা ঘুরে আসা। এ খরচটা আমার। অবশ্য এর জন্যে যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

ম্যাথিউসের এখন একমাত্র উদ্দেশ্য কার্যসিদ্ধি করা। ম্যাথিউস রাজি হয়ে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে, আমরা পোর্ট সৈয়দ পর্যন্ত প্লেনে যাব। তারপর দেখি ওখান থেকে কীরকম কী ব্যবস্থা করা যায়।

লোহিত সাগর পেরিয়ে ভূমধ্যসাগর। এই দুয়ের মধ্যে রয়েছে সুয়েজ খাল। ফরাসি ইঞ্জিনিয়ার লেসেপস্ এটা কেটে নাম দিলেন কেনেল। এটাই এখন সুয়েজখাল নামে বিখ্যাত। সুয়েজ ক্যানেল নদীর মতো। খুব একটা চওড়া নয়। দুটো জাহাজ পাশাপাশি যেতে পারে এই পর্যন্ত। ক্যানেলের দু'ধারে গাছের সারি। যেতে যেতে ওটা যখন গিয়ে হ্রদে পড়েছে তখন এ জায়গাটা খুব চওড়া হয়ে গেছে। অপূর্ব দৃশ্য। দু'ধারে পাহাড় তার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে ক্যানেলের জল। এই ক্যানেলটা গিয়ে যখন ভূমধ্যসাগরে পড়েছে সেইখানেই গড়ে উঠেছে পোর্ট সৈয়দ। ছোট্ট একটা শহর। ভারি সুন্দর মনোরম। কিন্তু প্রাকৃতিক রুক্ষতাও প্রচণ্ড। ওদের দেশে যাবার সময় ডান দিক দিয়ে আর ফেরার সময় বাঁ দিক দিয়ে ট্রাফিক চলে। আমাদের দেশের ঠিক উল্টো। সারা শহরে ছড়িয়ে আছে ফরাসী আর ইউরোপীয় প্রভাব। এখান থেকে কায়রো ১৩০ মাইল ভেতরে। পোর্ট সৈয়দ ঘুরে ওরা কায়রোর দিকে যাত্রা করল। বিখ্যাত নীলনদের বদ্বীপ। বদ্বীপের কাছটায় শুধু তৃণলতা আর গুল্ম—তারপর যতদূর চোখ যায় শুধু বালি আর বালি। কায়রো থেকে আর ২০ মাইল দূরে পাঁচ হাজার বছরের পুরনো নগর মেমফিস। মেমফিসের কাছে পৃথিবীর ঐতিহ্যময় শহর ব্যবিলন। রোমানরা মিশর জয় করে এখানেই দুর্গ করে থাকতো। রোমানদের পর এল খ্রিস্টান। তারপর এলেন খালিফা এল. মুইজ—তিনি এখানে এল-কাইরো বলে একটা নগর তৈরি করলেন। সবাই এল-কাইরোকে বলতে লাগল লে-কাইরে। তার থেকে পরে নাম হয় 'ক'য়রো'। সপ্তম

শতাব্দীতে খলিফা ওমর ব্যবিলন অধিকার করে এলফাসটাট বলে একটা রাজধানীও তৈরি করলেন। এই রকম অসংখ্য ঘটনা দিয়ে গড়া ঐতিহ্যপূর্ণ দেশ কায়রো ব্যবিলন। কায়রো পৌঁছে ওরা একটা হোটেলে উঠল। পাঁচতারা হোটেল। দুটো এয়ারকন্ডিশান রুম নিলেন ম্যাথিউস। ওদের দুজনের জন্যে। সন্ধের পর নীচের লবিতে নাচগান খাওয়া-দাওয়া চলতে লাগল অনেক রাত অব্দি। পরদিন সকালে ম্যাথিউস বললেন—এবার আমরা আমাদের আসল লক্ষ্যস্থল গিজেতে রওনা হব। আপনার আর কিছু দেখার নেই তো।

নবরূপ বলল—একটা দিন আমায় সময় দিন। আমি কাল শুধু দোকানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখি।

ম্যাথিউস হাসলেন, দেখতে চান দেখুন—কিন্তু যে জিনিসের সন্ধান আমি আপনাকে দেব তা কিন্তু কোনো দোকানে আপনি পাবেন না।

নবরূপ বলল—আমি কিনব না—খালি দেখব।

—বেশ, আমরা তাহলে পরশুদিন ভোররাতে রওনা হব গিজে শহরের দিকে।

রাস্তায় যেতে যেতে আর একবার পুরনো কথা ঝালিয়ে নিতে বললেন ম্যাথিউস—এর আগে আপনাকে আমি আমার পরিচয় দিয়েছি। আসলে আমি হলাম দলের নেতা, আমার সঙ্গে বহু লোক কাজ করছে, এরা কিন্তু সবসময় সবকিছু লক্ষ্য রেখে যাচ্ছে। কোনোদিন কেউ কোনো বেইমানি করতে পারবে না। যে করবে তাকে বালির নীচে জ্যান্ত কবর দেওয়া হবে। আমরা মিশরীয়রা বেইমানি সহ্য করতে পারি না।

জিপে করে ওরা এগিয়ে চলল গিজের দিকে। ঠিক অন্যগুলোর মতো, সামনেটা একটু সবুজ তারপরই সীমাহীন বালি।

ম্যাথিউস বললেন—ঐ দেখুন দূরে গিজে, বালির ওপর বড় বড় কতগুলো পিরামিড দাঁড়িয়ে আছে। তারপর একটু দূরে একটা ছোট্ট পিরামিড দেখিয়ে বললেন—ঐ যে দেখছেন ছোট্ট পিরামিড আমরা ওখানেই যাব। ওটাই আমাদের গন্তব্যস্থল। আমাদের লক্ষ্যবিন্দু, তৃতীয় রাজবংশের প্রথম ফেরো যোসেবের পিরামিড। নবরূপ বলল—ওটা তো দেখছি খুবই ছোট্ট। ম্যাথিউস বললেন—সামনে যে পিরামিডগুলো দেখছেন ওগুলো কি ছোট না বড়? কি মনে হয় আপনার?

নবরূপ বলল—ও, ও-তো বিশাল।

ম্যাথিউস বললেন—ঠিক ঐ অত বড় পিরামিড যোসেবেরও। কিন্তু অর্ধেকটা ঢুকে গেছে বালির নীচে। আমাদের লোক সব খুঁড়ে বার করবে। কিন্তু মনে আছে তো দরজা খোলার কাজটা আপনার।

নবরূপ ঘাড় নেড়ে বলল—মনে আছে।

ম্যাথিউস বললেন—আগেই বলেছি। এখনও বলছি, আমাদের সঙ্গে রয়েছে বিরাট দল। মেশিন, গাড়ি সব রেডি। এখন চলুন, আমরা কোনো বড় হোটেলে আশ্রয় নিই। রাত বারোটার পর হবে আমাদের অভিযান শুরু।

—রাত বারোটা? কেন? এ কি রকম নিয়ম এদেশে? নবরূপ একটু বিরক্ত হয়েই বলল কথাগুলো। ম্যাথিউস চালাক লোক। একদম রাগলেন না। বললেন—গভীর রাতই তো প্রশস্ত। কেউ কোথাও থাকবে না—কেউ ঝামেলা করবে না।

সে রাতটা নবরূপের জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ওরা যখন পিরামিডের কাছে গিয়ে পৌঁছল ম্যাথিউসের লোক তখন পিরামিডের তলাটা বার করে ফেলেছে। সে বিরাট একটা যন্ত্র পরিষ্কার করে ফিরে চলে গেল। নবরূপ দেখল, বালির তলায় পিরামিডের দরজা। সোনার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছে দরজাটা। দরজার মাথার ওপর নকশা। দরজার গায়ে সে যুগের কারুকার্য। ছোট্ট দরজা একমানুষ সমান কিন্তু প্রচণ্ড ভারী। দরজায় হাত দিতে গিয়ে হাত সরিয়ে আনল নবরূপ। দরজার মাথায় কি লেখা। নবরূপ তো আর মিশরীয় ভাষা পড়তে পারে না। তাই বাধ্য হয়ে জিগ্যেস করল ম্যাথিউসকে—ওখানে কি লেখা আছে! ম্যাথিউস ভগবানকে প্রণাম জানালেন। ভাগ্যিস নবরূপের মিশরীয় ভাষায় দখল নেই, নয় তো ঠিক পড়ে সে বলত ওকে কি আছে। ম্যাথিউস খানিকটা পড়ার ভান করে বললেন—এই আমি আপনাকে যা বলেছিলাম, সেই কথা। মিশরীয় কেউ এই দরজায় হাত দিলে যোসেবের আত্মা তাকে ছাড়বে না।

আসলে যেটা লেখা ছিল সেটা হল এই রকম ঃ

"এখানে তৃতীয় রাজবংশের প্রথম ফেরাও শান্তিতে রয়েছেন। কোনো মানুষ, জন্তু বা যে কোনো জীব যদি এই শান্তি ভঙ্গ করে তবে তার মৃত্যু অনিবার্য। বন্ধ দরজা হল শান্তির দ্বার। সেই দরজায় যে আঘাত হানবে, যোসেবের পরলোকগত আত্মার অভিশাপে সে হবে অভিশপ্ত। তার মৃত্যু অবধারিত।"

ম্যাথিউসের কথা বিশ্বাস করে নবরূপ এগিয়ে চলল দরজার দিকে। একা নবরূপ এগিয়ে চলেছে, চারপাশের কর্মীরা লক্ষ্য করছে। তারাও ম্যাথিউসের কথা বিশ্বাস করেছে। ম্যাথিউস তো যে কোনো লোককে দিয়ে দরজা খোলাতে পারতেন। নবরূপকে ধরলেন কেন। আসলে তার কারণ আর কিছুই নয়—যে কোনো লোক লাগিয়ে কাজ করালে যে করাচ্ছে পাপটা তারই হয়। এজন্য মোটা টাকা খরচ করেও ম্যাথিউস বাঁচতে পারতেন না। কিন্তু এখানে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টো। নবরূপ এখানে উদ্যোক্তা।

তার ধনসম্পদ চাই। সে পিরামিড খুলে অর্ধেক পাবে ভেবেই এগোচ্ছে তার নিজের স্বার্থে। এখানে ম্যাথিউস শুধু গাইড। পথপ্রদর্শক। পাপ তাঁকে স্পর্শ করবে না।

নবরূপ এগিয়ে গেল। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে তার। পিরামিডের লুকানো দরজা খুলছে ও, একি কম কথা! কোনোদিন কলকাতায় কেউ এমন কথা ভেবেছে! দরজায় হাত দিতেই একটা ইলেকট্রিক শকের মতো লাগল নবরূপের। ছোট্ট একটা ধাক্কা সামলেও নিল সে। মুখ ফিরিয়ে নিজেই বলল নবরূপ, প্রচণ্ড কারেন্ট লাগল।

ম্যাথিউস ওপরে দাঁড়িয়েছিলেন। ওঁর চোখ দুটো লোভে শিয়ালের চোখের মতো আগুন বেরচ্ছে। নবরূপ বলল—মিঃ ম্যাথিউস, আমি ভয় পাচ্ছি। আপনি বরং অন্য লোককে ডাকুন।

ম্যাথিউসের মুখখানা থমথম করছে। বললেন, খুলতে তোমাকে হবেই। শুধু শুধু এত টাকা খরচ করে তোমাকে এনেছি?

ম্যাথিউসের গলার স্বরের এই পরিবর্তন ভয় পাইয়ে দিল নবরূপকে। তবু সে বলে ওঠে—তোমার এত লোক আছে তাদের বলতে পার না!

মুহূর্তের মধ্যে ম্যাথিউস নেকড়ে বাঘের মতো বালির পাঁচিল থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নবরূপের সামনে। নবরূপ দেখল—তার দিকে দু' দুটো বন্দুক তাগ্ করে রেখেছে ম্যাথিউস। তাঁর দু'হাতে দুটো বন্দুক। ম্যাথিউসের এরকম রূপ এর আগে দেখেনি নবরূপ। চাপাস্বরে বলে ওঠেন ম্যাথিউস—হয় মর। আর নয় এখুনি দরজা খুলে দাও।

নবরূপ একা এসেছে। তার কোনো দলবল নেই। এই মুহূর্তে সে ম্যাথিউসের কথা না শুনলে এই বালির তলায় ওরা ওকে শুইয়ে দেবে চিরদিনের মতো। আশেপাশের লোকগুলো ওর দিকে তাকিয়ে আছে শ্যেনদৃষ্টিতে। না বলার কোনো আর উপায় নেই। গায়ের জোরে ঠেলল নবরূপ দরজাটাকে। নাঃ, একটুও নড়ল না। এবার রীতিমতো ধাক্কা দিল নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে। দরজাটা বোধহয় আধ ইঞ্চির মতো খুলল। একটা ঠান্ডা কনকনে জোরালো অশরীরী হাওয়া ধাক্কা দিয়ে গেল। ও পড়ে যাচ্ছিল, সামলে নিল কোনো রকমে। ভেতরটা পুরোপুরি অন্ধকার। ম্যাথিউস আবার চ্যাঁচালেন, দরজাটা পুরোপুরি খুলে যায়নি। আরও জোরে টানা দরকার।

পাথরের দরজা, খোলা কি কম কথা! নবরূপ আবার দু'হাত দিয়ে দরজাটা ধরে এক হ্যাঁচকা টান দিল। আর একটু ফাঁক হল। এখন কোনোরকমে একটা লোক ঢুকতে পারে। ম্যাথিউস বললেন—মিঃ শীল—আমরা কিন্তু কেউ আপনাকে সাহায্য করব না। আপনি কি মনে করেন দরজা খুলেছেন?

ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হল না নবরূপের। অর্থাৎ আরও চওড়া করে দরজা না

খুললে ওরা সবাই ঢুকবে কি করে। ঘাম ছুটে যাচ্ছে নবরূপের। এবারে সে পিঠ দিয়ে ঠেলতে লাগল। একটা দিক হাট করে খুলে গেল। বড় বড় মশাল জ্বেলে ম্যাথিউস বললেন—এবার দেখা যাক ভেতরটা। মিঃ শীল, আপনি আগে চলুন।

মশালের আলোয় অন্ধকার গুহা আলো হয়ে গেল। একটা বড় কারুকার্য করা কফিন। তার ভেতর শুয়ে রয়েছেন যোসেব। চারদিকে অসংখ্য ঘর—গৃহস্থালীর জিনিস। তাঁর প্রিয় শৌখিন জিনিস। তাঁর ব্যবহার্য পায়ের জুতো, জামাকাপড় থরে থরে সাজানো। যা কিছু দেখা যাচ্ছে সব সোনা আর দামী দামী পাথর বসানো জিনিসপত্র। ম্যাথিউস ফিসফিস করে বললেন—আপনি যা নেবার নিন তারপর আমরা নেব। কি নেবে তাই ভেবে পাচ্ছে না নবরূপ। সোনার ফুলদানি, সোনার মুকুট, সোনার থালা-বাটি-গ্লাস কোনোটা তার মনে ধরল না। এসব নিয়ে সে কি করবে। তার চাই বিশেষ কোনো বস্তু যা দুর্লভ আবার অমূল্য—যেটা সে তার কিউরিও রুমে রাখতে পারবে। নবরূপ দেখছে আর ভাবছে। আর তার চারধারে ম্যাথিউসের দল নিস্পন্দ নিথর হয়ে তাকে লক্ষ্য করছে। কারণ কবরের নীচে শব্দ করা বারণ। হঠাৎই চোখে পড়ল নবরূপের এক অদ্ভুত ধরনের পাখি। লম্বা ঠোঁটটা ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে। পাখির শরীরটা গোল আর পা দুটো সরুসরু লম্বা। পাখিটা সোনার। ওর চোখ দুটো আসল হীরের, গায়ে পালকের মতো আঁচড় কাটা সোনার ওপর লাল-সবুজ মিনে করা। মাত্র আট ইঞ্চি লম্বা আর পাঁচ ইঞ্চি চওড়া জিনিসটা সত্যিই অপূর্ব। নবরূপ বলল—এবার তোমরা যা খুশি কর। আমি যা নেবার নিয়ে নিয়েছি। আর আমি কিছু নেব না। পাখিটা হাতে নিয়ে পিরামিডের তলা থেকে বেরিয়ে এলো নবরূপ। ওদিকে ভোর হয় হয়। সব জানাজানি হয়ে গেলে দেশের লোক তাদের ছাড়বে না। তাড়াতাড়ি করে আবার যোসেবের পিরামিড বালির মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে লাগল ম্যাথিউসের লোকেরা। ম্যাথিউস বেরিয়ে এসেছেন। ওঁর হাতে মস্ত বড় একটা থলি।

নবরূপ ম্যাথিউসকে ডেকে বলে—এবার তুমি বল আমি কবে দেশে ফিরব। কিসে ফিরব। আর এই পাখিটাকে যদি কাস্টমসে ধরে তখন কি করব।

ম্যাথিউস খুব খুশি ছিলেন নবরূপের ওপর। উনি ভাবতেই পারেন না এত টাকার লোভ ভারতীয়রা সামলায় কেমন করে। এখন সে প্রচুর টাকার মালিক হবে। ম্যাথিউস বলে ওঠেন তাড়াতাড়ি, তোমাকে ফেরানোর দায়িত্ব আমার। কাস্টমস চেকিংও হবে না। তুমি সোজা জিনিস নিয়ে বাড়ি চলে যাবে।

ম্যাথিউস যা বলেছেন ঠিক তাই করেছেন। নির্বিঘ্নে নবরূপ চলে গেল কলকাতায় নিজের বাড়িতে। সুটকেসের মধ্যে রয়েছে জিনিসটা। সেটা খুলে নবরূপ গেল বাবাকে

দেখাতে সেই ছোট্ট পাখিটা। উনি বললেন—করেছিস কী! এ তো অমূল্য সম্পদ। বাজারে তো এর দাম কম করে কুড়ি লাখ টাকা। বেচে দিবি?

অবাক হয়ে গেল বাবার কথা শুনে নবরূপ। মানুষটা কি ব্যবসা ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না, নাকি বুঝতে চায় না! কে জানে। তিনদিনও গেল না, বাড়ির মধ্যে অস্বাভাবিক সব কাণ্ড ঘটতে লাগল। রোজ রাত্তিরে কিউরিও ঘরের মধ্যে থেকে নানা ধরনের শব্দ হতে লাগল। কখনও ডানা ঝাটপট কখনও হিস্ হিস্ শব্দে। নবরূপ দরজা খুলে উঁকি মেরে দেখল। কই কিছু তো নেই। সব ঠিকঠাক যেমন ছিল তেমনি আছে। চারদিনের দিন গভীর রাতে আবার ঘুম ভেঙে গেল নবরূপের প্রচণ্ড মারামারির শব্দ। তার সঙ্গে আস্বাভাবিক মোটা গলার গোঁ গোঁ শব্দ। এবার আর কোনো ভুল নেই শব্দটা আসছে দেওয়ালের ভেতর দিক থেকে। নবরূপ কিউরিও ঘরটা খুলে লক্ষ্য করতে লাগল কিন্তু কোনোরকম অস্বাভাবিক কিছু দেখল না। চিন্তিত মনে চলে আসছিল হঠাৎ থমকে দাঁড়াল নবরূপ। ফিরে গেল যেখানে সাপটা ছিল। হ্যাঁ, সে নিশ্চিত যেখানে সে সাপটা রেখেছিল সেখানে সাপের বদলে বসে আছে সেই সরু লম্বা ঠোঁট পাখিটা। আর পাখিটার জায়গায় বসে আছে সাপটা। অবাক হয়ে গেল নবরূপ। এঘরে ও ছাড়া আর কেউ ঢোকে না। এঘরের চাবি কোথায় থাকে সেটাই কেউ জানে না। তাহলে এরকম অঘটন ঘটল কি করে! সে কি তবে ভুল করে.... অসম্ভব। মনে মনে ভাবল নবরূপ....তার পরিষ্কার মনে আছে ঠিক জায়গায় সে ঠিক জিনিস রেখেছিল। এবার নবরূপ সত্যিই ভয় পেল। ঘরের মধ্যে দাপাদাপি ছোটাছুটি কোনোটাকেই সে যেন আর উড়িয়ে দিতে পারল না। আরও একটা ঘটনা হল, ক'দিন ধরে নবরূপ অনুভব করছে—কেউ যেন সবসময় তাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। সবসময় সে দেখতে পাচ্ছে কিন্তু ধরতে পারছে না। বাড়িতে তো অনেক চাকর লোকজন। তাহলে কি কানাঘুষোয় রটে গেছে তার কাছে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে। আর সেইজন্যেই হয়তো কেউ তাকে খুন করার চেষ্টা করছে! না, এ সে কিছুতেই হতে দেবে না, একটা কিছু ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল নবরূপ। হঠাৎ মনে হল কে যেন তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ঘুমটা ভেঙে গেল। প্রথমে মনে করেছিল স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন নয়, তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল কালো এক ছায়ামূর্তি। জলদগম্ভীর স্বরে সে বলল—আমার সম্পত্তিতে হাত দেবার অধিকার কে তোমাকে দিয়েছে? আমার কবরের শান্তি তুমি ভেঙেছ। হাজার হাজার বছর ধরে রাখা আমার জিনিস তুমি নিয়ে এসেছ। এই পাপের শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে। তুমি

জান না আমার কবরের গায়ে লেখা ছিল যে এই দরজায় হাত দেবে তার মৃত্যু অনিবার্য? তারপরেও তোমার এমন অন্যায় কাজ করতে আটকাল না?

—না, এতে আমার কোনো দোষ ছিল না। আমাকে ম্যাথিউস বলেছিল। তাছাড়া আমি মিশরের ভাষা পড়তে পারি না। ম্যাথিউস আমাকে বলেছিল কোনো মিশরবাসী ওতে হাত দিতে পারবে না। আমি তো ভারতীয়—। হাত জোড় করে বলল নবরূপ।

ছায়ামূর্তি ঠিক তেমন গলাতেই বলে ওঠে—তোমার মধ্যে লোভ ছিল। লোভ মানুষকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যায়। ম্যাথিউস তোমার ঐ লোভকে কাজে লাগিয়েছে। সেও পার পাবে না। এখন তুমি প্রস্তুত হও। শোন, তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয়বস্তু নিয়ে এসেছ। ছায়ামূর্তি বলতে বলতে নবরূপের সামনে একেবারে কাছে এসে গেল। নবরূপ পরিষ্কার দেখছে—এটা মমি নয়। মমি যে কাঠের বাক্সে রাখে তার আকৃতিটা হয় ঠিক মানুষের মতো। মিশরের এটাই বৈশিষ্ট্য। সাতফুট লম্বা একটা কাঠের মূর্তি। তার নাক-মুখ-চোখ সব আছে। দুটো হাত জড়ো করে বুকের ওপর রাখা। পায়ের কাছটা জড়ো করা। সমস্ত বাক্সটায় অসাধারণ কারুকার্য করা। এমনকি মনে হয় যেন রঙিন জামাকাপড়ও পরানো। এই মূর্তি সেইরকম অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে নবরূপের কাছে। নবরূপ বলল—তোমার প্রিয় কি জিনিস আমি এনেছি! আমি তো কিছু নিইনি শুধু একটা পাখি।

ছায়ামূর্তি বলল—হ্যাঁ, ঐ পাখি ছিল আমার পোষা। আমার সব চেয়ে প্রিয়। ওকে ছাড়া আমি একমুহূর্ত থাকতে পারতাম না। তাই আমার মৃত্যুর পর ঐ পাখিকেও আমার সঙ্গে মমি করে রাখা হয়েছিল।

নবরূপ বলল—না না, ওটা তো মমি নয়, ওটা সোনার।

নবরূপ লক্ষ্য করল কাঠের মূর্তির মধ্যে চোখ দুটো জীবন্ত। তার ভেতর থেকে যেন আগুন বেরচ্ছে। বলল— হ্যাঁ, সোনা দিয়ে ওকে বাঁধানো হয়েছিল।

নবরূপ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ঠিক আছে তুমি নিয়ে নাও তোমার প্রিয় পাখি। আমাকে ছেড়ে দাও।

ছায়ামূর্তি হাসল। সারা ঘর কেঁপে উঠল সে হাসিতে।

বলল—সে তো আমি নেবই। কিন্তু আমার সমাধিতে শান্তিভঙ্গ করার অভিশাপটাও তোমাকে বরণ করতে হবে। তোমার একমাত্র শাস্তি মৃত্যু।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে এল। নবরূপ ঘর থেকে বেরিয়ে কিউরিও রুমের দিকে এগিয়ে গেল তার মুখে একটাই কথা —আমি আমার সব কিছু তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, তুমি আমায় মুক্তি দাও এস তুমি— এস আমার কিউরিও ঘরের মধ্যে এস। তুমি যা চাও

সব নাও—কোটি কোটি টাকার জিনিস আছে সব নাও। বলতে বলতে নবরূপ কিউরিও ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। পেছনে ছায়ামূর্তি। তখনও হেসে চলেছে। বুকের মধ্যে থরথর করে কাঁপছে নবরূপের। হাত-পায়ের ঠিক নেই। রাত তখন গভীর। চারদিক নিস্তব্ধ। ছায়ামূর্তি প্রায় ওর শরীরের ওপর এসে পড়েছে। নবরূপ ভুলে গেল কিউরিও ঘরে কারেন্ট চালানো আছে। সুইচ না নিভিয়ে চাবি না নিয়ে ও অন্যমনস্কের মতো দরজায় হাত দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে দেখা গেল নবরূপের কাঠ হয়ে যাওয়া স্থির শরীরটা কিউরিও ঘরের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমটা সবাই মনে করেছিল বন্ধ ঘরের সামনে নবরূপ কি করছে দাঁড়িয়ে? পরে ব্যাপারটা বোঝা গেল।

একমাত্র নরেন শীল—নবরূপের বাবা জানতেন মিশর থেকে ছেলে কি এনেছে। সাপটাও তাকে দেখিয়েছিল নবরূপ। কিন্তু পরে যখন খোঁজা হল দেখা গেল সব কিছু যেমন ছিল তেমন আছে। শুধু সাপ আর ঐ পাখিটাকে কোথাও আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

———

Collect More Books >
From Here